নির্জন স্বাক্ষর

নির্জন স্বাক্ষর

বুদ্ধদেব বসু

ডি. এম. লাইব্রেরি
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট
কলকাতা ৬

এই উপন্যাসে তিনজন আধুনিক বাঙালি কবির রচনা থেকে উদ্ধৃতি আছে। এখানে তার প্রাপ্তিস্বীকার করি।

'কোথাও যাবে না, গলিতেই থাকবে,' শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর রচনা। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তর 'সত্য কেবল বাঁচা, কেবল বাঁচা, সত্য কেবল পশুর মতো মনের বালাই ঝেড়ে ফেলে বাঁচা'—এই পংক্তি সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত করেছি বইয়ের ৬ পৃষ্ঠায় এবং অন্যত্র। ৬১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পংক্তি দুটির প্রণেতা শ্রীযুক্ত জীবনানন্দ দাশ, যদিও উপন্যাসের প্রয়োজনে অংশত বদলে নিতে হয়েছে। মূলত পংক্তি দুটি এই :

'সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী,—ফুরায় এ-জীবনের সব লেন দেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'

এই আশ্চর্য পংক্তি দুটির এ-রকম স্বার্থপর ব্যবহার করলাম ব'লে আশা করি কবি জীবনানন্দ এবং তাঁর ভক্ত পাঠকরা আমাকে মার্জনা করবেন।

বু. ব.

১

কার্তিক মাসের এক শনিবারের বিকেলে এসপ্লানেডের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলো একজন—যুবক আর নয়, প্রৌঢ়ও বলা যায় না এখনো—পরনে ইস্ত্রিভাঙা জিনের প্যান্ট আর ঢলঢলে কোট, হাতে ছুটো পুঁটলি, মুখে ক্লান্তির কালো; ওখানে রোজ ট্র্যামের জন্য হাজার-হাজার যারা দাঁড়ায়, তাদেরই একজন। কিন্তু ভাবটা তার অন্য রকম; একটু স'রে দাঁড়িয়েছে, যেন ট্র্যামের জন্য দাঁড়ায়নি, দৃশ্য দেখছে, আবার আশে-পাশের দৃশ্যেও মন নেই, আর ঠোঁটের একটু-যে বাঁকা ভাব, সেটা যেন নিজেই নিজেকে ঠাট্টা। ঈষৎ চোখে পড়ার মতোই মানুষটা, তার চারদিকে যে-সব ফাঁকা-ফাঁকা চোখ মেট্রোর দেয়াল-ছবি থেকে ট্র্যামের দিকে, আবার ট্র্যাম থেকে কোনো শাড়িতে ঢাকা শরীরের দিকে অস্থির ছুটোছুটি করছিলো, তার কোনো-একটি যদি হঠাৎ ঐ বিশৃঙ্খল চুলের তলায় ক্লান্ত মুখের উপর পড়তো, তাহ'লে তখনই স'রে আসতে পারতো না; আর, একটু তাকিয়ে থাকলে এও হয়তো মনে হ'তো যে এই পুঁটলি-হাতে ট্র্যামের জন্য দাঁড়িয়ে থাকার পার্টটায় মানুষটা ঠিক যেন উৎরোচ্ছে না, অথচ চেষ্টা আছে খুব—আর তাই তার ঠোঁটের ঐ বাঁকা ভাবটা, হাসির মতো, ঠিক হাসিও না।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে সত্যি তাকে একজন লক্ষ্য করেছিলো; এগিয়ে এসে বললো, 'সোমেনবাবু কেমন আছেন?'

সোমেন অবাক হ'লো না, মুখের ভাবেও বুঝতে দিলো না কিছু।

পথেঘাটে এমন অনেকেই তার সঙ্গে কথা বলে যাদের সে চেনে না—কি মনে আনতে পারে না। 'আপনাকে তো চিনতে পারলাম না', এ-কথা বলা ছেড়ে দিয়েছে আজকাল; কী আর হবে—এক-আধ মিনিটেরই ব্যাপার।

আবার প্রশ্ন হ'লো: 'ভালো?'

বাঁধা বুলির জবাবে বাঁধা বুলি না আউড়ে সোমেন একটু হাসলো।

'আপনাকে কিন্তু ধুতি-পাঞ্জাবিতেই ভালো দেখায়।'

সোমেন এবারেও কিছু বললো না। ভাবলো: কোট-প্যান্টই ভালো, পকেটমারের ভয় কম। ভিতর-পকেটে মাইনের টাকা। আছে তো?—কনুই দিয়ে চাপ দিলো—আছে।

'আপনার লেখা আর দেখতে পাই না আজকাল?'

সোমেন হঠাৎ উত্তর দিলো, 'আমি-তো পূজা-স্পেশলে লিখি না।'

এই তিরস্কার খুব সহজেই মেনে নিলো লোকটি। সোনার চশমার পিছনে চোখ মিটমিট ক'রে বললো, 'তা .আপিশের চাকরি ক'রে আর লেখা!'

সোমেনকে বিঁধলো কথাটা। নিজের মনে সব সময় যে কথা ভাবছে অন্যের মুখে তা শুনতে চায় না। আর কথা বলতে চায়নি, কিন্তু না-ব'লেও পারলো না: 'ও-সব কিছু না। আমাদের না-পারার সাফাই।'

সোমেনের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে লোকটি বললো, 'আপনি যখন প্রোফেসরি করতেন, অনেক বেশি লিখতেন কিন্তু।'

লোকটিকে মনে প'ড়ে গেলো সোমেনের। বিপিন ঘোষ: 'প্রবাল' নামে একটা মাসিকপত্র বের করেছিলো একবার। সে-সময়ে যারা তাকে বলতো, 'আপনি বড্ড লিখছেন, সোমেনবাবু; এত কি

ভালো?'—তাদের দলে ইনিও ছিলেন। আর আজকের নালিশ: কম লিখছেন।

'আপনি আজকাল কী করছেন?' সোমেন জিগেস করলো।

'আমি সেখানেই আছি। —এর সেক্রেটারির কাজ করি এখন। বিপিন ঘোষ যাঁর নাম করলো তিনি দেশের একজন ধনপতি, বাণিজ্যের রাজা, ভূতপূর্ব রাজমন্ত্রী। সোমেনের মনে পড়লো 'প্রবাল' কী-রকম জেহাদ চালিয়েছিলো এই ধনপতির বিরুদ্ধে, মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কত নোংরামি ছিটিয়েছিলো। তারপর বিপিন ঘোষের চাকরি হ'লো মহাপুরুষটির আপিশে, 'প্রবাল' বন্ধ হ'লো। সোমেন তাকালো একবার: মোটা হয়েছে বিপিন ঘোষ, ফুলকো লুচির মতো গাল, গোল মুখে ভরাপেট ভালোমানুষি।

যেন সোমেনের মনের কথাটা আঁচ ক'রে বিপিন ঘোষ বললো, 'এ-দেশে সাহিত্য ক'রে কী হবে, বলুন—যখন আপনাকেও নিজের হাতে বাজার ক'রে ট্রামের ভিড় ঠেলতে হয়!'

'ও-সবের জন্যই বুঝি সাহিত্য করা?' সোমেন হাসলো।

'তা হয়তো নয়—তবে—এ-সব কি আপনাকে মানায়?'

সোমেন একটু লাল হ'লো। সহানুভূতি চায় না সে; সহানুভূতির পরের ধাপই করুণা। ঝাঁঝালো গলায় বললো, 'পাখা মেলে আকাশে উড়লে মানায় বুঝি?'

'তা মন্দ কী। আপনার সেই দেবদূতের কবিতা প'ড়ে তখন—সত্যি, আপনিই ছিলেন আমাদের সাহিত্যের আশা, আর—' বিপিন ঘোষ হঠাৎ থামলো, মুখচোখের চেহারা বদলে গেলো তার। 'চলুন—ট্রাম' ব'লে হাত বাড়ালো।

সোমেন নড়লো না। তার আশে-পাশে একটা মানুষের ঢেউ

উঠলো, আর সেই ঢেউয়ের চূড়োয় ছুটলো মোটা শরীরে প্রশংসনীয় ক্ষিপ্রতা দেখিয়ে বিপিন ঘোষ। কনুই দিয়ে গুঁতোলো সে, পা দিয়ে মাড়ালো, লম্বা কালো হাতলটা ধ'রে ফেললো চট ক'রে, কাঁধ দুটোকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে সুকৌশলে ব্যূহভেদ ক'রে ফেললো। সোমেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলো: শুধু বিপিন ঘোষই না, আরো ক-জন উঠে পড়েছে, দু-জন মেয়েও। সে অবশ্য চেষ্টাও করেনি; ট্রামের চেহারা দেখেই চেষ্টা করেনি।

না, সে পারে না ও-সব। কেন পারবে? সে তো মানুষ; মানুষের স্বভাবে তো ধাক্কাধাক্কি গুঁতোগুঁতি নেই। সৌজন্য মানুষের স্বভাব; ধৈর্য মানুষের ধর্ম। কত কোটি বছরের ধৈর্যের ফলে মানুষ এসেছে এই পৃথিবীতে। যারা তাড়াহুড়া করেছিলো, দাঁত-নখ-শিংওলা প্রকাণ্ড সেই অগ্রগামীরা আজ কোথায়? ম্যামথ ম্যাস্টডন হ'টে গেলো, গণ্ডার গরিলা টিঁকলো না; সকলের পিছনে থেকে সকলের উপর জিতে গেলো মানুষ। সেই মানুষ সে। তাই সে পেছিয়ে পড়ে, তাই সে পথ ছাড়ে। ও-সব তোমার কুতর্ক, সোমেন মনে-মনে বললো, আসল কথাটা কবুল করো; তুমি দুর্বল, অযোগ্য, এই পৃথিবীতে জীবিকার যুদ্ধ ক'রে বেঁচে থাকার অযোগ্য। এই তো দাঁড়িয়ে আছো বোকার মতো কতক্ষণ! কেন? শক্তি নেই, তাই। ভিড় ঠেলে মেয়েরাও উঠে পড়লো—মেয়েরাও? কথাটা শুনলে মানহানির মামলা আনতো অ্যাটম-যুগের আছাড়-খাওয়া কোনো শক্ত-শুকনো মজবুত মহিলা।

আরো দুটো ট্রাম ছেড়ে দিতে হ'লো। এ-সময়ে এসপ্লানেডে ট্রামে ওঠা! একটু বেশি হাঁটলে ড্যালহৌসি স্কোয়ারেই ধরতে পারতো; নিমতলার ট্রামে এসে বদল করতে যাওয়াটাই বোকামি

হয়েছে।—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে; একটা সিগারেটও খাবি—কিন্তু দু-হাতই জোড়া। কেন কিনেছে এগুলো? মীরাকে খুশি করতে? খুশি—? এ-সব তো দরকার। বড্ড দরকার সংসারের; তাই-তো আপিশ থেকে বেরিয়ে হেঁটে-হেঁটে গেলো শস্তা হবে ব'লে বড়োবাজার; কিনলো শায়া, শেমিজ, বালিশের ওয়াড়—শেষটায় কী মনে ক'রে একটা শাড়িও। অন্ধকার বড়বাজার, দোকানগুলো অন্ধকূপ, দোকানিরা খুচরো খদ্দের চোখেই ভাখে না, আর জিনিশপত্র যেটাই একটু ভালো লাগে, সেটাই দেখি পকেট ছাড়ায়। বেশি শিক্ষিত হওয়াটা ভুল; শিক্ষা রুচি দেয়, টাকা আনে না, আবার রুচি মেটাতে—এই কলকারখানার কলকাতায়—টাকাই পারে। শস্তা জিনিশ কিনতে-কিনতে নিজের উপর তার রাগ হচ্ছিলো; আর নির্দোষ বিপিন ঘোষকে হাতের কাছে পেয়ে তারই একটু ঝাল ঝাড়লো। ঠিক বলেছিলো বিপিন—সোমেন তর্ক করছিলো কার সঙ্গে? সত্যি-তো তার পাখা মেলে আকাশে উড়তে ইচ্ছা করে, নীল নিষ্পাপ আকাশে; আর সত্যি-তো সে এই কারখানা-বাজার-ব্যাঙ্ক-রেডিওর চ্যাঁচামেচির খাঁচার মধ্যে বন্দী, আর তাই-তো তার কিছুই ভালো লাগে না। সেই দেবদূতের কবিতা! কিন্তু পাখা ভেঙে মাটিতে পড়েছে, আর মাটিতেও তার জায়গা নেই। রীতিমতো সংসারীও হ'লো না; মোটা, খুশি, নিশ্চিন্ত হওয়া দূরে থাক, টানাটানিতেই ডুবড়ে আছে এখনো;—এদিকে তার আকাঙ্ক্ষিত অমরত্ব এখন মরীচিকা। সে এখন 'ছিলেন'দের দলে, কূলহারা; না হ'তে পারলো অবিকল সে নিজে, না পারলো নিজেকে দুমড়ে-মুচড়ে সকলের মাপমতো বানাতে। না, কিছুই ভালো লাগে না; বাড়িতে না, আপিশে না, রাস্তায় না—কোনোখানেই না।

কোনোখানেই না ?

আর-একটা ট্রাম, এটার পাদানিতে জায়গা আছে। দুটো পুঁটলি এক হাতে সামলে সোমেন উঠে পড়লো। নিজে কোনো চেষ্টা করলো না, করতে হ'লো না; অন্যদের ঠেলায় স'রে-স'রে হঠাৎ এক সময় হেলান দিয়ে দাঁড়াতে পেলো।—তবু ভালো। পকেটে ব্যাগ? আছে। বাঁ হাতটি সে এমন ভাবে রাখলো যাতে ভিতর-পকেটটা চাপে থাকে; সাবধান, যা ভিড়! চেপে আছে একেবারে, গায়ে-গায়ে লেপটে আছে সব; অবস্থাটা অশ্লীল। কিন্তু সেও তো এখানে ঢুকেছে আস্ত একটা শরীর নিয়ে, সে না-উঠলে একটু-তো জায়গা হ'তো। এই ভিড়ের অঙ্গ সে, এই প্রকাণ্ড অশ্লীলতার অংশ। সে অসুবিধে করছে অন্যদের, অন্যেরা অসুবিধে করছে তার, প্রত্যেকে অন্য প্রত্যেকের অসুবিধে করছে। পৃথিবীতে জায়গা কম, মানুষ বেশি? এত যুদ্ধেও যথেষ্ট মরছে না? এত কৌশল ক'রেও এত বেশি জন্মাচ্ছে? লেবেনস্রাউম!—এই চীৎকার উঠছে চারদিকে; ট্রামে, বাড়িতে, সারা কলকাতায়, ভারতে, পাকিস্তানে, রাশিয়ায়—পৃথিবী ভ'রে এই চীৎকার—জায়গা চাই! জায়গা চাই! ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে সব,—যেমন ক'রে বিপিন ঘোষ ট্রামে উঠলো—যে যাকে পারছে ফেলে দিচ্ছে, মাড়িয়ে যাচ্ছে, থেঁৎলে, গুঁতিয়ে, ছিঁড়ে, কামড়ে এগিয়ে চলেছে বীরভোগ্যা বসুন্ধরার সুযোগ্য ভোক্তার দল। কিছু না, কিছু ভেবো না, কোনোদিকে তাকিয়ো না; এগিয়ে চলো।

এ-ই জীবন। এ-ই জীবন? 'সত্য কেবল বাঁচা কেবল বাঁচা, সত্য কেবল পশুর মতো বাঁচা!'—কে লিখেছিলো? কী-নিষ্ঠুর কথা, আর কত সত্য! কিন্তু এ-ই যদি সত্য হয়, তাহ'লে আর বাঁচা কেন?

অভ্যস্ত ভিড়ে, ভিড়ের চেনা-চেনা ময়লা হাওয়ায় সোমেনের যেন দম আটকে এলো। নড়বার উপায় নেই; কিন্তু নিচু হ'য়ে ঘাড় বেঁকিয়ে পিছনের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতে পারলো একবার: সবুজ ছড়িয়ে আছে ময়দান, হেমন্তের হলদে রোদে স্বাধীন। আশ্চর্য এই যে যা-কিছু হোক, সকাল বিকেল দিন রাত্রি ঠিকই আছে, আর মাসের কোনো-এক তারিখে আকাশে বাঁকা চাঁদ বেরোবেই। কিন্তু একদিন হয়তো কোনো প্রোটনকি ইলেকট্রন-বোমা পড়বে, তারপর এ-সবও বদলে যাবে। আর তখন যারা বেঁচে থাকবে (আমি নিশ্চয়ই—আশা করি—থাকবো না), তারা অবশ্য পারবে 'নতুন' পৃথিবী গড়তে। তার আগে নতুন?

চোখ সরিয়ে এনে সোজা হ'লো সে। বিকেলটা বাবুগিরি, মাংসপিণ্ডই বাস্তব। কিন্তু সে যদি একটু চুপ করে থাকে, শুধু একটু চুপ করে থাকে, তাহ'লেই শুনতে পায় কোন গান, কিসের কানাকানি? কবিতা জন্মেছে তার মনে—লজ্জার কথা—সত্যি। ওৎ পেতে আছে, পিছু-পিছু হাঁটছে, ধাক্কা দিচ্ছে গায়ে, আঁকড়ে ধরছে হাত। ছাড়ো। না, ভুলবো না মায়ায়; একবার ধরা দিলে পেয়ে বসবে। এড়িয়ে যাচ্ছে তাই, ফিরিয়ে দিচ্ছে, ভুলেই থাকছে যেন—দিনের পর দিন। ওরাও নাছোড়। চতুর প্যাঁচ ক'ষে হঠাৎ প্রায় জিতে যায়, প্রায় সে কলম তুলে—না! থাক, এখন থাক, যাক আরো ক-দিন; দেখা যাক।

আবার কবিতা লিখবে, এ-কথা ভাবতেই প্রেমে-পড়া যুবকের মতো তার বুক-দুরদুর করে, আর নিজের সেই অবস্থায় হাসিও পায়। সাত বছর, আট বছর একটি লাইন লেখেনি। চাকরি ক'রে যেটুকু সময় পায়, গল্প-টল্পই চেষ্টা করতে হয়—করতেই হয়। আগে তার

ম্যাস-ম্যাইনেস্তে চ'লে যেতো, নিজের খেতে চাষ করার সময় ছিলো। যুদ্ধ : দেশে-দেশে, বিশ্ব জুড়ে, হিন্দু-মুসলমানে ; যুদ্ধ কি থেমেছে ? বোমা পড়ছেই, গুলি চলছেই, দাম চড়ছেই, যে-কোনো দিকে যে-কোনো বদল নিশ্চিত খারাপের দিকে। আর-তো টে'কানো যাচ্ছে না স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অস্তিত্ব। আর এর মধ্যে নতুন ক'রে কবিতা জন্মালো ? ছাখো কাণ্ড ! আর সে ভেবেছিলো গেছে, জন্মের মতোই গেছে ও-সব।

এতক্ষণে এলগিন রোড। কী-লম্বা পথ ! এর পর থেকে নামবে কেউ-কেউ—উঠবেও—একই। পৌছবার আগে বসতে পাবে একটু ? উহুঁ।

ধরো, আজই যদি হাব মানি, আজই সন্ধেবেলায় কাগজ-কলমে ধরা পড়ি ? কান পাতলো নিজের মনে—কই ? হারিয়ে ফেললো ? না এটা ওদের ফাঁকি ; আচমকা ফাঁদে ফেলার চেষ্টা। জানি ও-সব ; আমিও শেয়ানা কম না। সোমেন, সব জেনেও, আবার ডুব দিলো : এবার ভেসে উঠলো মালতী সেনের মুখ। দুঃখ-পাওয়া মুখ। দুঃখ একরকম শ্রী দেয়, মেনে নিতে পারলে। কিন্তু কতটা মেনে নিতে পারে মানুষ ?

সেই পাঁচকোণা একতলার ঘরটা মনে পড়লো সোমেনের। ওর ভাড়া চল্লিশ টাকা ! তা থাকতে যে দিয়েছে সেটাই-তো বাড়িওলার দয়া ! কত লোক শেয়ালদা স্টেশনেই প'ড়ে আছে। বলেছিলো কোনো ট্যুশনি, বলেছিলো রেডিওতে যদি—; তার নামের জন্য ভেবেছে সে বুঝি ও-সব পাবে-টাবে। না, কিছুই সে পারে না ; আর পারলেও তার সময় কই ? নিজেরই চলে না, অন্যের জন্য সে কী করবে ? পারলে ভালো হ'তো, ভালো লাগতো। কষ্টে পড়েছে মালতী সেন—কত লক্ষ লোকেরই তো এই কষ্ট আজ, একে চোখে দেখলো

ব'লেই। ভাগ্যিশ দুটিই ছেলে; মেয়ে থাকলে কার কাছে রেখে রোজগারের চেষ্টায় বেরোতো ?

রোজগার। নোংরা কথা। পকেটে ব্যাগ ? আছে।

বড়ো ছেলেটির মুখে গৌতমের চোখ বসানো। গৌতম মনে রেখেছিলো তাকে, ছুটিতে কলকাতায় এলে দেখা করেছে সস্ত্রীক; তাকে—তাদের—যেতেও ব'লেছে তার ওখানে, ঢাকায়। 'একেবারেই ঢাকা ছাড়লে ? এসো একবার। নীলখেতে বাড়ি পেয়েছি, ডক্টর সাহা যেটায় ছিলেন—মনে আছে ?' মনে আছে। নীলখেতের আকাশখোলা বাগানওলা বাংলোর বাসিন্দা হওয়াই তো তাদের ছাত্রজীবনের চরম উচ্চাশা ছিলো। তা গেলে হয় একবার। কিন্তু হয়নি অবশ্য, যাওয়া হয়নি; আর কার মুখে যেন হঠাৎ একদিন শুনেছিলো গৌতম সেন মারা গেছে।

একটা চাকরি খালি হ'লো ঢাকা ইউনিভর্সিটিতে; টাটকা-পাশ-করা যুবকরা চঞ্চল হ'লো।

বেরিবেরির মড়ক সেবার; অনেক মরেছিলো। আর, অবশ্য, প্রত্যেকেই মরবে, আগে আর পরে দিয়ে কথা। কিন্তু গৌতমের স্ত্রী কি এ-সবে কোনো সান্ত্বনা পেয়েছিলো ?—তাছাড়া আগেতে আর পরেতে বড্ড তফাৎ হ'য়ে গেলো না তার কাছে ? শ্বশুরবাড়ি বিমুখ, বাপের বাড়ি গরিব, অতএব—ওঃ, হাত দুটো ছিঁড়ে পড়ছে, পোঁটলা-পুঁটলি রাখার একটা তাক ক'রে দিলে পারে ট্র্যামে।

কোথায় ? বেলতলা। একদল মেয়ে উঠছে—সিনেমা-ফেরৎ। আশে-পাশে তিনটে, চারটে সিনেমা। আরো হচ্ছে। থাকার বাড়ি নেই। তিনদিক-বন্ধ পাঁচকোণা একটা একতলার ঘর চল্লিশ টাকা।

ভালো কিন্তু লেগেছিলো সেই ঘরে, প্রথম দিনের পর আবার গিয়েছিলো তাই। আজ আবার। যাবে?

লেডীজ সীটে ধরলো না; হাতল ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকলো কয়েকজন। দাঁড়িয়ে থেকেও দিব্যি খুশি, অভ্যেস আছে, চলাফেরায় রপ্ত। একজন দাঁড়িয়েছে ঠিক তার সামনে; আঁটোসাঁটো মজবুত ফর্শা যুবতী—দেখতে ভালোই বোধহয়? সোমেন মন দিয়ে দেখলো একটু: কয়েকটা কাঁটা বেরিয়ে আছে খোঁপার; দারুণ দুলছে চাকার মতো দুটো কানবালা, গলা আঁকড়ে আছে লালচে নধর সোনার বিছে; আর তার ঠিক তলাতেই ঘাড়ের রংটা একটু কালো। অনেক দিনের জমা ময়লার উপর দিয়ে ভাঁজে-ভাঁজে ফুটেছে পাউডরের শাদা-শাদা রং। হঠাৎ একটা গন্ধ লাগলো নাকে—বড্ড কাছে দাঁড়িয়েছে—চুলের তেল আর পাউডর আর স্নান-না-করা ময়লা মেশানো কেমন-একটা গন্ধ; স্ত্রীলোকের গন্ধ, শরীরের গন্ধ। গা-টা বমি ক'রে উঠলো সোমেনের; খিদে পেয়েছে।

আরে! আবার কানাকানি ওদের। সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে লাইনগুলি, কোনোটা পুরো, কোনোটা একটু, কোনোটা ঝাপসা। কেমন ভালোমানুষ ভাবটা—যেন বসলে এখনই। কিন্তু মনে-মনে ভাবায় আর কলম নিয়ে লেখায় ততটাই তফাৎ, যতটা তফাৎ পাহাড় দেখায় আর পাহাড় চড়ায়। শুরু করবে আজ? না যাবে? কিন্তু কী-খবর নিয়ে যাবে? কিছুই সে করতে পারেনি, চেষ্টাও করেনি, কেমন ক'রে চেষ্টা করবে তা-ই জানে না। এমন একজনকেও মনে করতে পারে না, যে গানের শিক্ষয়িত্রী চায় কি চাইতে পারে। এক মীরার দাদার বাড়িতে—মীরাকে বলেওছিলো। 'বেশ-তো, তুমি বোলো না দাদাকে।' কিন্তু শ্রীপতিবাবুকে কোনো অনুরোধ? খুব সম্ভব তিনি

কথাটা রাখবেন, অযোগ্য কিন্তু দাম্ভিক ভগ্নীপতিকে ঋণী করার সুযোগ ছাড়বেন না, আর এর পর সারা জীবন মীরা সেখানে সুসংগত চিমটি কাটবে। সেজন্যই—না।

না, কিছুই সে পারে না। ঠিকানা ভুল করেছে মালতী সেন। নেহাৎই তাকে আগেই চিনতো ব'লে, নেহাৎই কলকাতায় আপাতত আর-কাউকে চেনে না ব'লে। তা চিনে-টিনে নেবে সকলকে। আট বছর ধ'রে এ-ই করে আসছে; এখন কি আর ভেসে যাবে? আর ঢাকার তুলনায় কলকাতায় কত বেশি সুযোগ। সুযোগও বড়ো, প্রতিযোগিতাও তীব্র। আর মালতী সেন—যদিও তার গানের গলা ঝালিয়ে নিয়েই দুই ছেলে নিয়ে টি'কে আছে স্বামী মরার পর থেকে —এখনো ঠিক ধাক্কা-দিয়ে-এগিয়ে-চলা শক্তপোক্ত মজবুত হ'য়ে ওঠেনি; ও-বিদ্যেটা বোধহয় কলকাতায় ছাড়া শেখা যায় না। এই কলকাতায় —যুদ্ধের পরের, বাংলাদেশ ভাগ হবার পরের চরিত্রহীন কলকাতায়— সে কি পারবে যুঝতে? এখনো তার মুখে মফস্বলের শ্যাওলা মোছেনি; এখনো সে ভিতু-ভিতু, বাধো-বাধো; এখনো সে নিচু গলায় কথা বলে। সেজন্যই ভালো লাগে।

রাসবিহারী মোড়। এখন হয়তো—আর এটুকুর জন্য! বসতে গেলেও চেষ্টা চাই; এ-ই ভালো, খাটুনি কম। ওঃ, পোঁটলা দুটো! যখন কিনেছিলো তার চাইতে কত বেশি ভারি এখন। শাড়িটা না-কিনলে হ'তো; না, না-কিনলে হ'তো না। কত দাম? আটাশ টাকা—মনে থাকে যেন, আটাশ! হ্যাঁ, যাবে। তাকে দরকার মালতী সেনের। দরকার কেন? কী পারে সে? এটুকু পারে: তার কষ্টে কষ্ট পেতে পারে। এটুকু পারে: এই হৃদয়হীন অচেনা শহরে কোথাও কোনো আশা না-পেয়ে যখন চল্লিশ টাকা ভাড়ার একটি ঘরে ফিরেছে

তখন একবার কাছে গিয়ে বলতে পারে, 'কেমন আছেন?' এখানে তার শক্তি আছে বইকি। হ্যাঁ—তার পাশে দাঁড়িয়ে কে যেন ফিশফিশ ক'রে ঠাট্টা করলো—দুর্বলের শক্তি আরো দুর্বলের কাছে। যারা কৃতী, যারা সুখী, তাদের কাছে পাত্তা পাও না; তাই কি তুমি দুঃখই ভালোবাসো? তোমার চেয়েও দুর্বল, তোমার চেয়েও অসহায় একজনকে কাছে পেয়েছো; তাই কি মালতী সেনকে তোমার ভালো লাগে?

হয়তো।

দেখা না-হ'লেই ভালো ছিলো; দু-জন দুর্বলের দেখা হওয়া উচিত না। কী হবে, কী লাভ হবে; তার দরকার তাকে না, তার দরকার আশ্রয়। যেয়ো না, সোমেন; ছেড়ে দাও; সে পারবেই একরকম ক'রে চালাতে; আর না যদি পারে—পারবে না। নবযুগের জোয়ারে লক্ষ লোক ডুবে যাচ্ছে পৃথিবী ভ'রে, লক্ষ লোক দেশের মধ্যে; এ-তো একজন।

কিন্তু এই একজনকে দেখছি-যে, চোখে দেখছি।

লেক রোড পেরোলো; সারি-সারি দোকান। শাড়ি, গয়না, জামা, শাড়ি, শৌখিন। উপচে পড়ছে কাউন্টর, সিঁড়ি, ফুটপাত। মেয়েই বেশি। রোজই এ-রকম; আজ আরো। শনিবার, মাস-পয়লা। ছেঁকে ধরেছে রং-বেরঙের জাঙাল, ঝাঁকে-ঝাঁকে স্ত্রীলোক। দেখে মনে হয় না কোথাও কোনো দুঃখ আছে।—ভুল! দুঃখই সব; দুঃখ ভোলার জন্যই এই ছুটোছুটি ছটফটানি; সেজন্যই গয়না পরা, জিনিশ কেনা, সেজন্যই মোটরে চ'ড়ে লেক-চক্কর। যে যেমন ক'রে ভুলতে পারে। যে যতক্ষণ ভুলে থাকতে পারে। কিন্তু কতক্ষণ—কতক্ষণ? যেখানেই যাও, যা-ই করো, ফিরতেই হবে শেষটায়। পথের ক্লান্তিকে যদি-বা ঠেকাতে পারো, পৌঁছনোর অর্থহীনতা আছেই।

সোমেন দরজার দিকে এগোলো, দুটো পুঁটলি এক হাতে নিয়ে আর-এক হাতে চুল সরালো কপাল থেকে। শাড়িটা কেমন? পছন্দ হবে তো? আটাশ টাকা। পকেটে ব্যাগ? আছে। ঠিক আছে। নেমে পড়লো ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ে। যাবে?

২

রোজ যেমন, তেমনি। নিখুঁত-গুছোনো ফিটফাট ফ্ল্যাট, সুশ্রী সক্ষম ফিটফাট নিখুঁত মীরা। সে ঘরে আসতেই বললো, 'এত দেরি হ'লো তোমার?'

পুঁটলি দুটো খাটের উপর ফেলে সোমেন কোণের কুঁজো থেকে জল খেলো, পাখা ছেড়ে দিয়ে ব'সে পড়লো ক্যানভাসের ইজিচেয়ারটায়।

মীরা উপরদিকে তাকিয়ে বললো, 'আজ তো ঠাণ্ডাই।'

'একটু থাক।'

'ইলেকট্রিক বিল উনিশ টাকা হয়েছে গেলো মাসে।'

সোমেন কিছু বললো না। অপরাধী পাখাটা ঘুরতে লাগলো মাথার উপর।

মীরা বললো, 'তোমার দেরি দেখে ভাবনা হচ্ছিলো। আজ মাইনের তারিখ, তার উপর শনিবার; আবার না সেই থিয়েটরের বন্ধুর পাল্লায় পড়ো। সেই-যে হোটেলে চব্বিশ টাকা উড়িয়ে রাত বারোটায় ফিরেছিলে!'

মনে করিয়ে দেবার দরকার ছিলো না; ঘটনাটা সোমেনের মর্মমূলে বেঁধা। দেখা হয়েছিলো অনেকদিন পর এক বন্ধুর সঙ্গে; সে আজকাল বই লেখা ছেড়ে সিনেমা বানায়; জোর ক'রে নিয়ে গিয়েছিলো তার একটা ফিল্ম দেখতে; তারপর কথা বলার জন্য দু-জনে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকেছিলো। রেস্তোরাঁর বিলটা সোমেনই

শুয়েছিলো—সাত না আট আট যেন—আর বাড়ি ফিরতে বেজেছিলো সাড়ে-দশটা। কিন্তু তথ্যের এ-সব গরমিল তুচ্ছ।

'তুমি তাকে থিয়েটারের বন্ধু বলো কেন?' অন্য একটা ভুল শোধরাবার চেষ্টা করলো সে। 'সে একজন লেখক।'

'লেখক!' মীরাব গলায় হাসির ঢেউ উঠলো, 'মদ আর জুয়োই তো লেখকদের পেশা। অন্যটা বললাম না। চিনি না তোমাদের!'

'অন্তত একজনকে তো ভালো ক'রেই চেনো।'

'তুমি!' মীরা হাসলো। 'তোমাকে মানুষ করলাম আমি তো;—যা ছিলে বিয়ের সময!

কথাটা শুনে লজ্জা কবলো সোমেনের, মীরার জন্যই লজ্জা করলো। বইয়ের আগের পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলা যায় না, তার সঙ্গে মিলিয়েই পরের অংশ লিখতে হয়। অনেক বদলায়, অনেক ভাঙে, কিন্তু সবশেষেব সর্বনাশের পরিচ্ছেদেও আগের অংশ আগের মতোই সত্য থাকে।

'কী আনলে?' মীরা এতক্ষণে পুঁটলি দুটোয় চোখ ফেললো।

'ত্যাখো।'

মীরা একটা প্যাকেট খুলে জিনিশগুলি বের করলো আস্তে-আস্তে। একটু নেড়ে-চেড়ে বললো, 'শেমিজ মোটা।'

'তা শীত তো আসছে।'

'অগত্যা সেটাই সান্ত্বনা!' মীরার ঠোঁট একটু বেঁকলো, অন্য প্যাকেটটায় হাত দিলো। সোমেন আড়চোখে দেখতে লাগলো স্ত্রীর মুখ, বেশ মন দিয়েই দেখতে লাগলো।

'শাড়ি কেন?'

সোমেন মুখ দেখে বুঝলো অপছন্দ হয়নি, মীরা খুশি হয়েছে।

ভালো। ভালো? খুশি হওয়া ভালো নিশ্চয়ই, কিন্তু খুশি করা? স্ত্রীকে খুশি করা আজ কি তোমার দরকার হয়েছে, সোমেন?

'যাক, তবু এতদিনে আমার জন্য হাতে ক'রে কিছু আনলে।' মীরা শাড়ির ভাঁজ খুলে গায়ের সঙ্গে লম্বা ক'রে ধরলো, তারপর মুখ তুলে সেই প্রশ্নটি করলো যার জন্য সোমেন ওটা কেনার পর থেকেই মনে-মনে তৈরি হচ্ছিলো।

'কত দাম নিলো?'

সোমেন একটু দম আটকে থাকলো।

'কত নিলো?'

'আটাশ টাকা,' আস্তে কথাটা বের ক'রে দিলো সোমেন।

'আ-টাশ টাকা!' মীরার খুশি-হওয়া মুখের ভাব নিমেষে বদলে গেলো। 'এই শাড়ি যে আমি কুড়ি টাকায় দেখে এলাম ভরদ্বাজের দোকানে!'

কুড়ি? তাহ'লে বড়োবাজারে দু-টাকা শস্তা। যাওয়া সার্থক।

'ঠকিয়েছে তোমাকে! বেদম ঠকিয়েছে!'

সোমেন বেচারা-মুখে বললো, 'এজন্যই তো ছাখো আমি এ-সব কিনতে-টিনতে যাই না।'

'কোন দোকানে কিনেছো?'

'বড়োবাজারে।' সোমেন একটু থামলো, স্ত্রীর কুঁচকোনো ভুরুর দিকে তাকিয়ে আরো মোলায়েম ক'রে বললো, 'আমি আরো ভাবলাম শস্তা হবে সেখানে। তা তুমি যেটা দেখেছিলে সেটা হয়তো এর চাইতে—'

'না, না!' মীরা মাথা ঝাঁকালো, কানের ফটা-ছাদের দুল নড়ে উঠলো তার। 'ঠিক—ঠিক এই শাড়ি। কোথায় কুড়ি আর কোথায় আটাশ! এ তুমি ফেরৎ দিয়ে এসো।'

'নেবে কি ফেরৎ ?'

'নিতেই হবে। টাকা ফেরৎ না দেয় অন্য শাড়ি—না-হয় আমিও যাই, বেছে-টেছে ঠিকমতো আনবো।'

সোমেন একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আবার সেই বড়োবাজার !'

'ঠিক জানতাম এ-কথা বলবে ! টাকা কি তোমার অনেক আছে যে আটটা টাকা জলে ফেলতে গায়ে লাগে না ? কী অলস তুমি, সত্যি !' মীরার গলা খড়খড়ে শোনালো, একটু থেমে আবার বললো, 'বেশ ! তুমি যেতে না চাও আমিই যাই !'

'একা-একা বড়োবাজার যাবে ?'

'সবই একা-একা করি, এও পারবো।'

সোমেন অভ্যেসমতো বললো, 'বরং হীরুকে খবর পাঠিয়ে—'

'কেন ? হীরু যাবে কেন ? আমি তোমার দাসী ব'লে আমার মামাতো ভাই তোমার চাকর না তো !'

সোমেন জানলার দিকে তাকালো। আকাশ পাংশু ; দিন ফুরচ্ছে। এই সময়টা তার ভালো লাগে আজকাল ; যখন সব ঘরে আলো জ্বলে, তার ইচ্ছে করে আলো না-জ্বেলে ব'সে থাকতে, ছায়ায় মিশে যেতে।

'দাও, ক্যাশমেমোটা দাও আমাকে,' মীরা উঠে দাঁড়ালো।

পকেট থেকে দুটো ক্যাশমেমো বের করলো সোমেন। মীরা হাতে নিয়ে তাকিয়ে বললো, 'এগুলো না—শাড়িরটা !'

সোমেন কোটের পকেট দুটো হাৎড়ালো। কেমন-কেমন মুখ ক'রে আস্তে বললো, 'তাই তো !' উঠে দাঁড়িয়ে কোটের সব ক-টা পকেটের সব জিনিশ বের ক'রে মীরার সামনে ছোটো টেবিলে সাজালো : রুমাল, সিগারেট, দেশলাই, কলম, মনিব্যাগ, ট্রামের

টিকিট। পাৎলুনের পকেট তারপর; হাতে ঠেকলো খশখশে কাগজ – দশটাকার নোটটা—কিছু খুচরো। খুচরোগুলিও বের ক'রে রাখলো।

'পেলে না?'

'দেখছি না তো—'

'মানে?' মীরা টেবিলে রাখা জিনিশগুলি সরিয়ে-সরিয়ে দেখলো; রুমালটা ঝাড়লো, ঘাঁটলো মনিব্যাগের ফোকর, ট্র্যামটিকিটের ভাঁজ। 'কী হ'লো?' ব'লে ঘুরে দাঁড়ালো স্বামীর দিকে।

সোমেন ঢোঁক গিলে বললো, 'প'ড়ে-ট'ড়ে গেছে বোধহয়।'

'প'ড়ে গেছে! হারিয়ে এলে ওটা! আচ্ছা বোকা তো তুমি!'

সোমেন দেখলো মীরার পিছনে চায়ের ট্রে হাতে রতন দাঁড়িয়ে। কখন এলো? শুনেছে কথাটা? ঘরের অন্য দিকে স'রে এলো সোমেন, কোট খুললো, জুতো ছাড়লো; না-তাকিয়েই বুঝলো মীরা ছোটো টেবিলের জিনিশগুলি সরিয়ে রাখছে, রতন সেখানে চায়ের ট্রে নামিয়ে চ'লে গেলো। বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে সোমেন আবার সেই ইজিচেয়ারেই বসলো। যাক—হ'লো। সত্যি যদি সে বোকা হ'তো, সত্যি যদি সে বোকা থাকতে পারতো! কিন্তু না—; সে চতুর হচ্ছে, তার পতন হচ্ছে। ভেবেছিলো, ভাবছিলো—কিন্তু সত্যি যে পারবে তা ভাবেনি। পারলো তো। শাড়িটা কিনেই ক্যাশমেমো ফেলে দিলো, দশটাকার নোটটা প্যাণ্টের পকেটে লুকোলো; তবু তার বিশ্বাস ছিলো না নিজের উপর, প্রায় ধ'রেই নিয়েছিলো যে শেষ মুহূর্তে হেরে যাবে। হারলো না, সেও পারে। কেমন উৎরে গেলো ধাপে-ধাপে, ঠিক-ঠিক। এই তার জীবনের প্রথম মিথ্যা; সচেতন, সক্রিয়, সুচিন্তিত মিথ্যা এই প্রথম। আর কার কাছে? তার

স্ত্রী, তার সন্তানের মা, তার বারো বছরের সঙ্গী, সারা জীবনের সঙ্গী। হ্যাঁ, সে 'মানুষ' হচ্ছে এতদিনে। মীরার দিকে তাকালো একবার: খাটের ধারে নিচুমুখে ব'সে মনিব্যাগের টাকা গুনছে। হঠাৎ মীরার জন্য কেমন কষ্ট হ'লো তার।

মীরা উঠে তার কাপড়ের আলমারিতে টাকা রেখে চাবি বন্ধ করলো। ফিরে এসে বললো, 'এ-মাসে না ইনক্রীমেণ্টের কথা ছিলো তোমার?'

'কই, হ'লো না তো।'

মীরা নিচু হ'য়ে টী-পটের ঢাকনা তুলে চামচে দিয়ে নাড়লো। মুখ তুলে বললো, 'কী ক'রে এই সংসার চলবে তুমি ভাবো কখনো?'

'চ'লে তো যাচ্ছে।'

'একে চলা বলে? এই-তো শীত আসছে, নতুন লেপ এবার না-করালেই নয়: কোথায় টাকা? বুলবুলের ফ্রক নেই, বাপ্টির জুতো নেই; কোথায় টাকা? সোফাটা সারাতে দিয়ে ছ-মাসের মধ্যে আর আনানোই হচ্ছে না: কোথায় টাকা? একে চলা বলে?'

সোমেনের চোখে পড়লো চায়ের ট্রের পাশেই তার সিগারেটের প্যাকেট। হাত বাড়িয়ে ধরালো একটি।

মীরা প্রায় একই স্বরে বলতে লাগলো, 'একেবারে খেয়ে নিয়ে ধরালেই পারতে। তুমি সিগারেটটা কম খেলেও তো একটু আয় হয় সংসারে। তিন মাসের বাড়িভাড়া বাকি—বাড়িওলা নেহাৎ লোক ভালো ব'লেই—কিন্তু যদি তাড়িয়ে দেয়, দাঁড়াবে কোথায় ছেলেমেয়ে নিয়ে? ফুটপাতে?' কথা শেষ ক'রে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিলো স্বামীর দিকে, লুচি, আলুভাজা।

চায়ে চুমুক দিলো সোমেন, সিগারেট নামিয়ে রেখে লুচিতে হাত

দিলো। যে-হাত চাবকায সে-হাত থেকেই খাবার খায় খাঁচায় পোরা জানোয়ার। খিদেটাই পশু।

একটু চুপচাপ। খামকা পুড়ে গেলো সিগারেটটা; না ধরালেই হ'তো—সত্যি।

খাওয়া শেষ হ'লে মীরা বললো, 'এ-ই নাকি শুধু? ছেলেমেয়ে বড়ো হচ্ছে না? খরচ এখন বেড়েই চলবে দিনে-দিনে। ভাবো একবার?'

'অত কেন ভাবছো? দুটি তো মোটে।'

'এখন দুটি—কিন্তু আর যে হবে না তা কি বলতে পারো জোর ক'রে? আমি খুব শক্ত মেয়ে ব'লেই, নয়তো এতদিনে কি আর—তুমি একটি যা!'

সোমেন লজ্জা পেলো, মাথা নামালো।

'আর যদি দুটিও ধবো, তাদেরও পড়াশুনো, মেয়ের বিয়ে—সবই আছে। আর নেই বলতে আমাদেব কিচ্ছু নেই। তোমার উদ্বেগও হয় না?'

মীরার মুখে চোখ বেখে সোমেন বললো, 'কী আমি করতে পারি বলো তো?'

'চেষ্টা করতে পারো, চেষ্টা!' মীরাব গলায় খড়খড়ে আওয়াজ দিলো আবাব। 'যোগ্যতা তোমার নেই তা তো না, কত নাকি বিদ্বান তুমি, বই-টইও লিখেছো—এই হতচ্ছাড়া চাকরি ছাড়া আর-কিছু তোমার জোটে না?'

সোমেনের মনে পড়লো কলেজের একশো-কুড়ি টাকার তুলনায় সওদাগরি আপিশের দু-শো টাকা কতই বেশি লেগেছিলো দশ বছর আগে। এক কোণে কাটা পড়লো লম্বা ছুটি, লেখার সময়—থাক, সংসার চলুক। তাও হ'লো না। দু-শো এখন চারশো

হয়েছে, আত্মা-ভাতা পঞ্চাশ, তবু হয় না, কিছুই হয় না—কিছুই হ'লো না।

'আর এখন তো সুবিধে কত! দেশ স্বাধীন হয়েছে—'

সোমেন হঠাৎ ব'লে ফেললো, 'দেশ স্বাধীন হ'যে তো এ-ই হ'লো যে গান্ধীকে গুলি ক'রে মারলো।'

মীরার ঠোঁট দুটি বেঁকলো, চোখ সরু হ'লো। 'ও-সব ধর্মের বুলি আউড়ে দিন কাটবে না মশাই, কাল যদি বাড়িওলাব নোটিস আসে, তাহ'লে ?'

তার চোখ সোমেনের মুখ থেকে সরলো না, তাই কিছু বলতেই হ'লো। 'আচ্ছা দেখি—'

'আচ্ছা। দেখি।' ব্যঙ্গ কর্কশ হ'লো মীরার গলায়। 'কোথাও যাবে না, কিছুই করবে না, ঘরে ব'সে শুধু আচ্ছা-দেখি! আচ্ছো বেশ!'

কী করবে? কোথায় যাবে? যা-ই করুক, মনে হবে অন্য-কিছু তার করা উচিত। যেখানেই যাক, মনে হবে অন্য কোথাও তার যাবার কথা। কোথায়? কোথাও না। 'কোথাও যাবে না; গলিতেই থাকবে।' কে লিখেছিলো?

'কথা বলছো না কেন?' এক ঝাঁকুনিতে উঠে দাঁড়ালো মীরা, মেঝের সরু জায়গাটুকুতে কোমরে হাত রেখে দাঁড়ালো। 'দায়িত্ব কি আমার যে আমি একা চেঁচিয়ে মরবো? না। তোমার স্ত্রী, তোমার ছেলেমেয়ে, তোমার সংসার!' মীরা সোমেনের কাছে এলো, আরো কাছে, ইজিচেয়ারে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে প'ড়ে-থাকা নির্বাক মানুষটার দিকে গলা বাড়িয়ে-বাড়িয়ে বলতে লাগলো, 'ওঠো তুমি। বেরোও বাড়ি থেকে। যাও লোকের কাছে, হাঁটো, খাটো, মন্ত্রীদের ধরো, যা-হয় করো,

যেমন ক'রে পারো টাকা আনো—আমি আর পারবো না জোড়াতাড়া দিয়ে চালাতে !'

একটু থামলো। সোমেন তাকিয়ে দেখলো সুন্দর একটি সাপ তার মাথার উপব ফণা তুলে দুলছে। চোখে চোখ পড়তেই মীরা আবার কথা বললো, 'কত লোকেব কত কিছু হচ্ছে, তোমাব কেন হয় না ? হয় না এইজন্য যে তোমার উদ্যম নেই। হয় না এইজন্য যে তুমি পুরুষ না !'

কথা শেষ হবার পরেও দু-জনে তাকিয়েই থাকলো দু-জনের দিকে। এই চোখোচোখি যেন ফুরোবে না ; প্রেমের মতোই অন্তহীন এর লিপ্সা।

মীরা হঠাৎ স'রে গিয়ে বললো, 'আলোটা জ্বেলে দে, বুলবুল।'

আলো জ্বললো। আলোয়, আব দবজার ধারে দাঁড়ানো দুটি ছেলে-মেয়েতে, ঘরটা অন্য রকম দেখালো। বুলবুল এগিয়ে এসে বললো, 'তোমরা অন্ধকারে ব'সে ছিলে ?'

মীরা বললো, 'রতনকে ব'লে আয় তো চায়ের বাসনগুলো নিয়ে যাক।'

বুলবুল ডাকলো, 'রত—ন।'

'ডাকতে হ'লে তো আমিই পারতাম। রান্নাঘরে গিয়ে ব'লে আয়।'

বাপ্টি বাবার কোলে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। আমাকে নিয়ে আজ বেড়াতে যাবে না, বাবা ?'

সোমেন তার পিঠে হাত রেখে বললো, 'এই-তো বেড়িয়ে ফিরলে।'

'শনিবার যাবে বলেছিলে। আজ শনিবার !'

যাবে ?

কোলের মধ্যে গড়িয়ে-গড়িয়ে উপুড় থেকে চিৎ হ'লো বাপ্টি।

মুখে একটা আঙুল পুরে সীলিংটা দেখতে-দেখতে বললো, 'সেই ছবি-আঁকা টিনের বিস্কুট আজ দেবে না ?'

মীরা এ-ফাঁকে সোমেনের আনা শাড়ি-শেমিজ তুলে রাখছিলো, মুখ ফিরিয়ে ধমক দিলো, 'কী বিরক্ত করছো, বাণ্টি! এই আপিশ থেকে এলেন বাবা! আর আঙুল সরাও মুখ থেকে!'

বাণ্টি অনিচ্ছায় বাবার কোল ছাড়লো। তার বিষণ্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে সোমেন শরীরটাকে টেনে তুললো ইজিচেয়ার থেকে; আস্তে-আস্তে বাথরুমে ঢুকলো।

স্নান ক'রে বেরিয়ে দেখলো, মীরা টুকটুকে লাল সিল্কের শাড়ি প'রে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আয়নার দিকে তাকিয়েই বললো, 'আমি একবার দাদার ওখানে যাচ্ছি।' শাড়িটায় এখানে ওখানে ছোট্ট দু-একটা টান দিয়ে স'রে এলো। 'চল, বুলবুল। বাণ্টি—'

বাণ্টি বললো, 'আমি বাবার সঙ্গে—'

'চলো, চলো, জুতো কিনতে হবে তোমার।'

'জুতো কিনবে? কী-মজা!' বাণ্টি ছুটে গেলো মা-র আগে-আগে।

সোমেন পিছন থেকে বললো, 'পারো তো একটিন বিস্কুট কিনে দিয়ো ওকে।'

মীরা থামলো না, যেতে-যেতেই চাপা গলায় বললো, 'হ্যাঃ! ওদের সব আবদার রাখতে গেলেই হয়েছে!'

চুল আঁচড়ে, পাটভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি প'রে সোমেন একা ব'সে-ব'সে একটি সিগারেট খেলো, তারপর সেও বেরোলো।

৩

নামলো গড়েহাটের মোড়ে ট্র্যাম থেকে। ভিড়। বালিগঞ্জই কলেজ স্ট্রীট আজকাল; কত দোকান। আরো হচ্ছে। দেখায় যেন ইঞ্চি জমি নেই মিলেগা, কিন্তু বাজার গজাব ভোজবাজি। স্বভাব মার্ট খুলে গেলেন খদ্দরপরা লাটসাহেব; সেখানে একটা শস্তা ফ্ল্যাটের ছু-তুলা তুললে কয়েক-শো লোকের মাথা গোঁজার—কোন দোকানটা না? ওদিকে। দুটো গয়নাদোকানের মাঝখানে। ভিড়। রোজই; আজ বেশি। মাসপয়লা, শনিবার। টাকপড়া স্যুটপরা ভদ্রলোক, উড়ুক্কু ছোকরা, সপরিবার বাবুরা, যুবকের সঙ্গে যুবতী—স্বামী-স্ত্রী—বোধহয়; —আর স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক। কত গয়নার দোকান এটুকু জায়গার মধ্যে—পানদোকানের সমান-সমান। কেনে কে? আছে কেনবার লোক। সে গরিব ব'লে সবাই তো আর—এই-তো। শো-কেসে ব্যাগ। যদি মীরাও এ-দোকানে? না, মীরা এতক্ষণে তার দাদার বাড়িতে মুদিয়ালি রোডে।

'আমি একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ চাই।'

'মেয়েদের ব্যাগ?'

'হ্যাঁ, মেয়েদের।'

দোকানি গোটাতিনেক দেখালো।

'কত দাম?'

'এটা বাইশ টাকা, এটা আঠারো, আর এটা—পনেরো টাকা বারো আনা।'

'দশ টাকার মধ্যে কিছু নেই ?

'ছোটো হবে।'

'ছোটোই দিন।'

ছোটো কয়েকটা এলো।

'কচিপাতা রঙেরটা কত ?'

'এই গ্রীনরঙেরটা ? সাড়ে-ন'টাকা।'

'দিন।'

সোমেন ব্যাগ নিয়ে বেরোলো।—উঁ ? মেয়েদের ব্যাগ হাতে রাস্তায়—? ফিরে গিয়ে বললো, 'এটা একটা কাগজে জড়িয়ে দেবেন কি ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন দেবো না।' কাগজের ঠোঙায় ব্যাগ ভ'রে দোকানি বললো, 'আর কিছু চাই না ?'

'না, আজ আর না।'

'আচ্ছা, আবার আসবেন। নমস্কার।'

বেশ ভদ্র তো লোকটি। নতুন খুলেছে দোকান, তাই। একটু পুরোনো হ'লেই—। তা ব্যাগটা বেশ পাওয়া গেছে দশ টাকায় মধ্যে। রংটা ভালো। কাগজের ঠোঙাটা বাড়িকে—কিন্তু কী ক'রে দেবে ?

সত্যি, কী ক'রে দেবে ? গিয়েই ? না আসবার আগে ? কী বলবে দেবার সময় ? না কি কিছু না-ব'লে রেখে আসবে ? বাঃ ! তাহ'লে তো পাঠিয়ে দেবে ফন্তুকে দিয়ে তখনই, কি নিজেই নিয়ে আসবে কাল। আর মীরা বলবে—শ্‌শ্‌! মরেছিলো আরকি। এই জীপগুলো !

একটু দাঁড়িয়ে থেকে সোমেন রাস্তা পার হ'লো। ঝাঁকালো

মোড় হয়েছে গড়েহাট, একটা পুলিশ দেয় না? আর হাঁটা কি যায় এ-রাস্তায়; ফুটপাত নেই, আব গাড়ির যা হুটোপুটি। রোজই; আজ বেশি। শনিবার, মাসপয়লা; ফুর্তি। একটু সাবধানে হাঁটুন, কবিমশাই; চলতে-চলতে মিল ভাববেন না। মিল? মনে হচ্ছে যেন বাদ দিলেই সুবিধে। তা সুবিধে চাও তো লিখো না, লিখোই না, সুবিধে সবচেয়ে বেশি তাতেই। লেখায় অসুবিধেই সব। ছাড়িয়ে এলাম? না, সামনে।

সোমেন বাঁ দিকে বেঁকলো কাঁকুলিয়ায়। সরু-সরু গলি, ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি, বাচ্চারা রাস্তায়। স্পষ্ট জাতে নিচু পাড়াটা। তুমিই বা কোন উঁচু জাতের মানুষটা শুনি? কাল যদি বাড়িওলা, তাহলে? হ্যাঁ, মিল দেবে। খেয়ালের মিল না, নিয়মের মিল। আঁটো কাঠামো, হালকা ভাষা, সুর গম্ভীর। দেখতে শাদাশিধে, যেন সাধারণ কোনো কথা সাধারণভাবে বলা। বলবার একটা কথা জন্মেছে তার মনে, জরুরি হচ্ছে দিনে-দিনে, মনে হচ্ছে তৈরি, ঠোঁটের আগায় তৈরি। ভুলো না ওতে। ওটা ওদের ফাঁকি, ফাঁদ। উল্টো ফাঁদ পাতো; আঁটো কাঠামো, নিয়মের মিল, ছন্দের বাধ্যতা। বাধা দাও ওদের, অসুবিধে ঘটাও—যত রকম সম্ভব। ভয় করে। যা বলা যায় না তা-ই বলতে চায়, তাই ভয় করে। কলমের প্রথম আঁচড়েই ভেঙে যাবে না তো? পারবে লিখতে? না, লিখতে তো তাকে হবে না; ও তো আছেই, ভাষা আর মিল আর ছাপা অক্ষরের ছিপছিপে চেহারা, সব নিয়েই আছে—ছিলোই, সে শুধু ফাঁদ পেতে ধরেছে—ধরবে। ঐ ফাঁদ বানাতেই প্রাণান্ত। দাঁড়াও। এই বাড়ি? এমন ঘেঁষাঘেঁষি, আর প্রত্যেকটা বাড়ি পাশেরটার মতো। এই বাড়ি।

সোমেন থামলো; একবার তাকালো ন্যাড়া বোবা কুচ্ছিৎ দোতলাটার

দিকে। আর-কিছু ভাবেনি: কোনোরকমে দেয়াল বানিয়ে ছাদ তুলেছে, কোনোরকমে ঠেকিয়েছে রোদ, বৃষ্টি, আকাশ। কিন্তু সেটাই তো দরকার। আকাশে বাসা নেই; ছাদের তলায় দেয়ালের মধ্যে থাকলে তবে-তো জানলা দিয়ে—। কাল যদি বাড়িওলা।

'কাকে চাই আপনার?'

হেঁটো ধুতি, খোলা গা, আধবুড়ো মোটা মানুষ দাওয়ায় দাঁড়িয়ে। সোমেন বললো, 'আমি মিসেস সেনের কাছে এসেছি।'

'অ! মিসেস সেন!'—'মিসেস' কথাটায় জোর পড়লো বেশ—'অই দিক দিয়ে।'

সোমেন ঢুকে পড়লো পাশের গলিটায়। পিছন দিকে ঘর। চলো। হাতে এটা—? সেই ব্যাগ। কিন্তু কী ক'রে?

ফল্গু গুনগুন ক'রে পড়ছিলো ব'সে, তাকে দেখে লজ্জা পেলো, উঠলো, টিনের চেয়ারটা এগিয়ে দিলো।

খোলা বইটার দিকে চোখ ফেললো সোমেন। ব্যাকরণকৌমুদী। সে পড়িয়ে দিতে পারে, নিজেরও বেশ ঝালানো হয় সংস্কৃতটা।

'তুমি বোসো। পড়ো।'

ফল্গুর চোখ—গৌতমের চোখ—সোমেনকে আস্তে ছুঁয়ে গেলো।

'আপনি বসুন।'

'আমি এখানে বসছি।' সোমেন তক্তাপোশে বসলো। এখানে আরামও—সুজনির তলায় বিছানা পাতা। কিন্তু চেয়ারটা সম্মানের চিহ্ন; দূরত্বের।

'পড়ো তুমি,' সোমেন আবার বললো।

কিন্তু ফল্গু আর বসলো না, ভিতর দিকের দরজা দিয়ে মিলিয়ে গেলো। দরজায় পরদা, খদ্দর, খয়েরি। শাড়ি ছিলো? ওপাশে

সিঁড়ির তলার জায়গাটুকু দয়া করে ছেড়ে দিয়েছেন বাড়িওলা; সেখানে তোলা উনুনে রান্না। একটা ক্যানভাসের বেড়া আছে, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে যারা ওঠে নামে তারা দেখতে পায়। তা রান্না কতটুকুই বা। যে রাঁধে, রাঁধবার বস্তুটাও তো সে-ই জোগায়। সোমেন পরদাটার দিকে তাকালো; কিছু দেখা গেলো না ওপাশের। শব্দও নেই, গলা, ছ্যাকছ্যাক, ঠুংঠাং, কিছু না। ভাত ফুটছে? চুপচাপই থাকে তিনজনে, ছেলে দুটিরও বা কম। কি হয়তো বলার কিছু নেই। ছেলেরা মা-র দিকে তাকায়, মা চোখ সরিয়ে নেয়, কেউ কিছু বলে না।

সোমেনও সরালো, চোখ ঘুরিয়ে আনলো ঘরের চারদিকে—পাঁচদিকে। বোবা ঘর; একটিমাত্র জানলা, আর দরজা তো দুটোই বন্ধ রাখতে হয় রাত্রে। তা মন্দ কী: এও বাড়ি, যেখানে মানুষ আছে, প্রাণ আছে, সেখানেই বাড়ি। একটি তক্তাপোশ, একটি কেরোসিন কাঠের টেবিল—পড়ার টেবিল, একটি টিনের চেয়ার। তক্তার পায়ের দিকে পড়েছে পাঁচটা দেয়ালের সবচেয়ে সরুটা; সেখানে পর-পর সাজানো মস্ত রংচটা ট্রাঙ্ক, বড়ো আর ছোটো সুটকেস, ভাঁজ-করা তোশক, বালিশ, রংচটা সুজনিতে ঢাকা। একটা গোল-করা মাদুর দাঁড়িয়ে আছে কোণে। দু-ছেলে তক্তায় শোয়, মা মেঝেতে। আর-একটা তক্তা? ধরবে কি? ঘরে যেটুকু খালি জায়গা, তার একদিকে হার্মোনিয়মের বাক্সের উপর ছিটকাপড়ে মোড়া তানপুরো দাঁড়-করানো, অন্যদিকে কলসি, কুঁজো, আর ঠিক দুটো ক'রে থালা আর গেলাশ। ঠিকই আছে, একসঙ্গে তিনজনের তো খাওয়া হয় না, আগে ছেলেদের খাইয়ে তবে তো। আর রান্নার বাসন-টাসনও রাত্রে এখানেই—হ্যাঁ, তা তো রাখতেই

হবে, বাইরে চুরি যায় যদি? কত কিছু লাগে, বেঁচে থাকতে হলে কত কিছুই লাগে মানুষের। ওয়েটিংরুমে দশ ঘণ্টা কাটাতে হ'লে সেখানেই সংসার জ'মে ওঠে। যাক, এতটাও যে আনতে পেরেছিলো ঢাকা থেকে—কম তো নয়—আর যা-সব শুনি। কী ক'রে আনলো, কেমন ক'রে এলো? কিছুই জিগেস করা হয়নি। কী-কথা হয়েছে এর আগে? কতটুকুই বা কথা? কতটুকুই বা দেখা। তবু। কেন?

ভাগিাশ শাবেকি বাড়ি, দেয়ালে তাক আছে। কাজে লেগেছে খুব। নিচেরটায় পুরু ক'রে কাগজ পেতে ভাঁজ ক'রে-ক'রে রেখেছে হাফ-প্যান্ট, শার্ট, শাড়ি। মাঝেরটায় চায়ের পেয়ালা, একটি কাচের গ্লাশ, আয়না, চিরুনি, সাবানের কেস, পাউডরের কৌটো—ধারে-ধারে ছেঁড়া সেই হাতব্যাগটা, যেটা দিয়ে সেদিন আধুলি গ'লে মেঝেয় পড়েছিলো। সবই লাগে; কোনটা না-হ'লে চলে? উপরের তাকে বই, স্কুলপাঠ্য, অন্যও কয়েকটা; তার নিজেরও একটা আছে ওর মধ্যে। বিয়েতে উপহার পাঠিয়েছিলো 'মালতী ও গৌতম সেন' নাম লিখে। আছে এখনো কপিটা; দেখে ভালো লাগলো সেদিন।

মালতী সেন ঘরে এসে বললো, 'আমার দেরি হ'লো।'

'আমি এই এলাম,' সোমেন উঠে দাঁড়ালো, তাকালো। উনুনের আঁচে লালচে কালচে মুখ, উশকো চুল, শাড়ির ময়লা মেটে রঙে ঢাকেনি। ছেড়ে আসবে জায়গা কোথায়। বাধ্য হ'য়েই ঘরোয়া। কিন্তু সেইজন্যই।

আঁচলে মুখ মুছে মালতী বললো, 'আপনি বসুন।'

এবার টিনের চেয়ারটাতেই বসলো সোমেন। সে যদি তক্তাপোশে, অন্যেরা? সে-তো বাড়ির লোক না। ছেলে দুটি লজ্জা পায় তাকে। ঐ-তো ফন্তু তক্তাপোশে বসেছে দেয়াল ঘেঁষে আড় হ'য়ে, আর আঙু

বসলো একমাত্র জানলাটির তাকে শিক ধ'রে বাইরে তাকিয়ে। কিন্তু বাইরে কী? গলি, নর্দমা, দেয়াল।

'আপনি বসবেন না?'

তক্তার শিয়রের দিক থেকে হাতপাখাটা তুলে নিয়ে মালতী বললো, 'দাঁড়াই একটু।'

পরের মুহূর্তেই সোমেনের গায়ে হাওয়া লাগলো। ত্রস্তে বললো, 'আমার হাওয়া লাগবে না।'

'গরম।' যেন আপন মনে মালতী বললো।

'আমাকে তবে পাখাটা দিন।'

'আমি আপনাকে বাতাস করছি না, আমি নিজেই—' সোমেনের চোখে চোখ পড়তে মালতী হঠাৎ আবার বললো, 'আমি আপনাকে হাওয়া করছি না, আমারই দরকার।'

সোমেন চোখ নামালো। কিছু কি ফুটেছিলো আমার মুখে? আমিও তো বাঙাল। আর মালতী সেনের কথায় একটু-যে বাঙাল টান, সেটা—মন্দ কী, মিষ্টি। চোখ তুলে আবার বললো, 'আপনি বসবেন না?'

'বসছি।' কিন্তু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পাখাই নাড়তে লাগলে মালতী, আর সোমেনের মনে হ'লো সবটা হাওয়া তার পিঠেই পৌঁচচ্ছে। অস্বস্তিতে কাঁটা হ'য়ে ব'সে থাকলো একটু, তারপর উঠে চেয়ারটাকেই হাওয়ার বাইরে সরিয়ে নিয়ে বললো:

'আপনি দয়া ক'রে বসুন: দু-একটা কথা বলি।'

কী কথা?

মালতী পাখা রেখে দিলো। তক্তাপোশে বসতে গিয়ে—সোমেন দেখতে পেলো—তার চোখে পড়লো কাগজের ঠোঙায় সওদা। ঈষৎ বদলালো সোমেনের মুখের রং।

মালতী বললো, 'আপনি নিজের হাতে কেনাকাটাও করেন?'

কী ভাবে আমাকে? 'করি মাঝে-মাঝে, ব'লে সোমেন অপেক্ষা করলো। এর পরেই জিগেস করবে, 'কী কিনলেন?' আর তখন—তখনই—কী বলবে?

কিন্তু মালতী আর-কিছু বললো না। তা হোক—বলবে? বলবে এখন? না:, দেরি হ'য়ে গেছে। ফশকালো সুযোগ। যদি অন্য কোনো কথাও বলতো, তাহ'লে সেই কথাকেই ঘুরিয়ে এনে—কিন্তু কিছুই বলছে না। চুপ ক'রে ব'সে আছে নিচু মুখে, মাথার কাপড় একটু সরেছে, ধবধব করছে সিঁথিটা। আগে কেমন দেখতে ছিলো মালতী সেন? গৌতমের সঙ্গে যখন? কী জানি। বোধহয় অন্য সব মেয়েদের মতোই, তাই মনে পড়ে না। এখন সে অন্যদের মতো না, এখন সে অন্য রকম। সাবা গায়ে গয়না নেই, শাড়ি-জামা ফ্যাকাশে, কথা যখন বলে তখনো যেন মুখচোখ তার চুপ ক'রেই থাকে। মানিয়েছে তাকে, এটাই যেন ঠিক সে: ফ্যাকাশে, ভিতু, অনিশ্চিত। সেইজন্যই।

সোমেন হঠাৎ বুঝলো, সে মালতীর দিকেই তাকিয়ে আছে এতক্ষণ। তাড়াতাড়ি কথা পাড়লো, 'বোধহয় অসময়ে এসেছি। আপনার রান্না—'

'রান্না হ'য়ে গেছে।' মালতী চোখ তুললো, একটু পরে বললো, 'মীরাদি এলেন না?

'দি' কেন? শুনলে খুশি হ'তো না মীরা, বলতো, 'ও আমার পাঁচ বছরের বড়ো অন্তত।' কিন্তু বয়সে ছোটো হ'লেও মর্যাদায় দিদি বইকি। মীরার স্বামী আছে, খাওয়া-পরার ভাবনা নেই। মীরা সুখে আছে। অন্তত লোকে তা-ই জানে।

ভিতরে-ভিতরে একটু চেষ্টা ক'রে সোমেন জবাব দিলো, 'আজ তাঁকে দাদার বাড়ি যেতে হ'লো।'

মালতী একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'একদিনও তো এলেন না মীরাদি।'

সত্যি! আর সে এই নিয়ে তিন দিন। বিবাহিত ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলার কাছে যাচ্ছে, সস্ত্রীকই তো দস্তুর। ভালো দেখাচ্ছে না? না, ভালো দেখাচ্ছে না। হয়তো কেউ কিছু—যে-রকম ঘেঁষাঘেঁষি পাড়া, আর মাথার উপর বাড়িওলা। কেমন ক'রে বললো 'মিসেস'টা! কিন্তু অন্যের বলাবলিব দরকার কী, মালতী সেনের নিজের মনেই অস্বস্তি—হ'তে তো পাবেই। আমি কেন ধ'রে নিচ্ছি ইনি আমাকে বিশ্বাস করেন, বিশ্বাসযোগ্য ভাবেন? ওঃ, কখনো, জীবনের কোনো সময়ে কোনো অবস্থাতেই কি ভোলাযাবে না যে এই মেয়ে আর এই পুরুষ? কী ক'রে ভুলবে? আজ মালতী সেন না-হ'য়ে যদি কানাই ভটচায হ'তো— বলো তো সত্যি ক'রে?

'একদিন নিয়ে আসবেন,' মালতীব নবম গলা আবার শুনতে পেলো সোমেন।

নিয়ে আসবো? আজকাল কি আর স্ত্রীদের কোথাও 'নিয়ে যায স্বামীরা? না, ও-সব আর নেই, ব্যাপাবটা আর নেই, ভাষার ভঙ্গিটা শুধু আছে।

'ছেলেদের পড়াশুনোর কী করবেন?' যাক অন্য-কোনো কথা খুঁজে পেয়েছে।

'ভাবছি।'

'সামনের জানুয়ারিতে স্কুলে দেবেন নিশ্চয়ই?

'উচিত তো।'

'প্রোমোশনের আগেই চ'লে এলো—একটা বছর না নষ্ট হয়।'

'হ'লে আর কী করা।'

উৎসাহ নেই কথায়; অন্য কিছু ভাবছে? না কি শুনতে চায়, তার মুখে কোনো খবর শুনতে চায়, আশার খবর? কোনো আশা সে আনেনি, নিজের আশাহীনতা নিয়েই এসেছে। ফন্তুর পিঠের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ফন্তুর দেখছি খুব পড়ায় মন।'

কথাটা ফন্তুর কানে গেলো, নিচু মাথা আরো নিচু হ'লো।

'কোন ক্লাশে না পড়ে ওরা?'

'ফন্তুর নাইনে আর অংশুর সিক্সে ওঠার কথা।'

এর পরে চুপচাপ। মুখ নিচু মালতীর, চোখের পলক শুধু চোখে পড়ে। আমার যাওয়া উচিত। যদি কোনো খবর দেবার না থাকে তাহ'লে যাওয়া উচিত। সারাদিনের সব কাজ শেষ ক'রে কোথায় এখন স্বাধীনভাবে একটু শোবে, জিরোবে—তা তো না, উড়ে এসে জুড়ে বসলেন সোমেনবাবু। হ্যাঁ, যাই। তা-ই সে চায়।

'আমি যাই,' ওঠার ভঙ্গি করলো সোমেন।

'বসুন।' প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মালতী আবার বললো, 'চল, তোদের খেতে দিই।'

দুটি ছেলেই অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলো, কিন্তু উঠতে একটুও দেরি করলো না। ভারি বাধ্য তো। আর বাণ্টি বুলবুলকে কতবার তাড়া দিতে হয়!—কিন্তু এরা তো আর যখন-তখন বিস্কুট চকোলেট খায় না। খাওয়াকে সমীহ করতে এরা শিখেছে।

ঘরের কোণ থেকে দু-জনে দুটো থালা-গেলাশ তুলে নিয়ে অংশু ফন্তু চ'লে গেলো। মালতী যেতে-যেতে থামলো; ফিরে তাকিয়ে বললো, 'বসুন। যাবেন না।'

'বসুন। যাবেন না।' কথাটা শুনে কাঁপলো যেন বুকের মধ্যে? বুকের কলকব্জায় মরচে পড়েনি এখনো? প্রথম যখন মীরার সঙ্গে দেখা—; সোমেনের ভাবনা থেমে গেলো। আর হবে না, সে-রকম আর হবে না জীবনে। যা হ'য়ে গেছে তা আর হবে না, কিন্তু যা হয়েছিলো তা আছেই। হারায় না কিছুই, সব থাকে। মনে পড়লো তার তখনকার কবিতা, মুখর কবিতা, ছন্দের আনন্দ। ছন্দ, তোমার মায়ায় আর ভুলবো না আমি। তোমাকে উপোশ করিয়ে শুকিয়ে ফেলবো। কৃশ হও, আস্তে বলো, ভুল বোলো না। আমার হ'য়ে কথা বলো তুমি, সকলের হ'য়ে কথা বলো।

সোমেন একটা সিগারেট ধরালো।

সঙ্গে-সঙ্গে মালতী ফিরে এলো ঘরে। সোমেন উঠে দরজার ধারে গিয়ে সিগারেটটা গলিতে ফেলে এলো।

মালতী বললো, 'সিগারেটে আমার অসুবিধে হয় না।'

না, অভ্যেস আছে। গৌতমও সিগারেট খেতো। তাছাড়া জীবিকার ধাক্কা: জীবিকা অসুবিধে মানে না। কিন্তু এর আগের দিন ওঠার সময় মেঝেতে ছাই আর সিগারেটের চ্যাপ্টানো টুকরো দেখে নিজেরই তার ভালো লাগেনি; এখানে যেন মানাচ্ছে না; আর সাফ করার খাটুনিও তো।

সোমেন বললো, 'ওরা খেলো না?'

'খাচ্ছে।' সোমেনের আনা প্যাকেটটা সরিয়ে মালতী তক্তাপোশে একটু এগিয়ে ব'সে বললো, 'একটা—একটা ব্যাপার হ'য়ে গেছে এর মধ্যে।'

সোমেন আরো শোনার জন্য তাকালো।

'আমার কিছু—কিছু টাকা ছিলো—'

যাক, কিছু আছে!

'—এখানে এসেই এক ব্যাঙ্কে রেখেছিলাম।' মালতী একটু থামলো, অন্য দিকে তাকিয়ে খুব নিচু গলায় কথা শেষ করলো, 'সে-ব্যাঙ্ক ফেল পড়েছে।'

স্তব্ধতা নামলো ঘরে, রাস্তার কুকুরের ডাক সোমেনের কানে এলো।

'কোন ব্যাঙ্ক?'

'গণেশ ব্যাঙ্ক।'

গণেশ···? হ্যাঁ, মনে পড়ছে, সেদিন কাগজে চোখে পড়েছিলো খবরটা। ছোটো অক্ষরে কয়েক লাইন। আপিশেও বলাবলি এ নিয়ে, সে কান দেয়নি—কী হবে। এতদিনে এ-সব মুখস্থ। যুদ্ধের জোয়ারে কত ব্যাঙ্কই ফেনালো, মোড়ে-মোড়ে উপচোলো, ভাঁটার টানে এখন ফুটফাট। যারা জুয়ো খেলে, যারা ঘুষ নেয়, যারা তহবিল ভাঙে, তারা সবখানেই আছে। কে কাকে ধরবে। এই একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত: কোনো ব্যাঙ্কেই কিছু নেই।

'কত ছিলো?' বাহুল্য প্রশ্ন, তবু।

'অল্পই।' মালতী যেন লজ্জা পেলো সংখ্যাটা মুখে আনতে, 'আটশো-মতো।'

আটশো! মালতী সেনেরও! আর তার? কাল যদি বাড়িওলা।

'একটা লাইফ-ইনশিওরেন্স ছিলো—দু-হাজার—তা-ই থেকে খরচ হ'য়ে-হ'য়ে—'

এ-সব বলছে কেন? আমি কি জানতে চেয়েছি?

'বড়ো-বড়ো বিজ্ঞাপন দেখেছি, আর পাড়াতেই ব্যাঙ্ক, তাই পোস্টাপিশে না-রেখে ওখানেই—'

এমনভাবে বলছে যেন গণেশ ব্যাঙ্ক ফেল পড়াতে তারই কোনো দোষ হয়েছে।

'সেদিনও টাকা তুলে এনেছি—আজ সকালে গিয়ে দেখি তালাবন্ধ।'

'আগে শোনেননি ?'—শুনলেই বা কী হ'তো ?

'আমি আর কার কাছে শুনবো। কাগজ-টাগজও পড়া হয় না তেমন। আজ তো শনিবার ?'

'হ্যাঁ, শনিবার।'

'প্রথমে ভাবলাম ভুল করেছি, আজ বুঝি রবিবার। তারপর আশে-পাশের দোকানগুলিতে জিগেস করলাম ; তারা অনেক কথা বললো, কিছুই বুঝলাম না।'

কেউ বোঝে না ও-সব। বোঝার কিছু নেই ; শুধু একটা কথা মনে রাখা চাই : সাবধান। সাবধান ! জুয়াচোর, চোর, পকেটমার নিকটেই আছে। দেশ ভ'রে এই অদৃশ্য নোটিস লটকানো। কিন্তু সর্বনাশের সাবধান নেই।

ঘরে নামলো স্তব্ধতা। কিন্তু সময় নেই, ফস্ক অংশু খেয়ে এলে আর—। মালতী আবার বললো, 'এখানে তো আমার তেমন-কিছু এখনো—ঐ থেকেই তাই—' হঠাৎ থামলো, একটি হাত সোমেন দেখলো ফিকে সুজনির উপর নিঃসাড়। সব খবর খবরকাগজে ওঠে না, আসল খবরই ওঠে না ; এখনো তাই সাহিত্য লিখতে হয়।

কিন্তু বেঁচে থাকায় ক্ষমা নেই ; বেঁচে থাকার বিরাম নেই। তাই হাতটি নড়লো, কানের পাশের চুলে পড়লো, আর ঠোঁট দুটি—ঠিক নড়লো না, কাঁপলো :

'টাকাটা কি আর পাওয়াই যাবে না ?'

জবাব দিতে দু-এক সেকেণ্ড দেরি করলো সোমেন। হালকা সুরে বললো, 'না-ই বা গেলো।'

মালতীর চোখ যেন এই প্রথম পুরোপুরি খুললো, যেন এই প্রথম পুরো চোখে সোজাসুজি তাকালো সোমেনের দিকে। প্রাণ ঢেউ ছিলো সোমেনের মধ্যে, প্রাণের শক্তি ছড়িয়ে পড়লো ফুশফুশে, কব্জিতে, মস্তিষ্কে। তারও শক্তি আছে: চরম অসহায় মানুষ তাকে শক্তি দিয়েছে।

একেবারে অন্যরকম গলায় সোমেন বললো, 'ভাবছেন কেন? একটা ব্যবস্থা হবেই।'

মালতী মেঝের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার কিছু গয়না আছে।'

'আচ্ছা, সে হবে। এখন আপনি ছেলেদের কাছে একবার—'

'ওদের হ'য়ে যাবে এখনই।'

সোমেনের মনে হ'লো মালতীর কথাটা সে বুঝেছে। হঠাৎ একটা ইচ্ছা হ'লো তার; ঐ থয়েরি পরদা পার হ'য়ে অংশু ফন্তুর খাওয়ার কাছে দাঁড়াতে: কী খাচ্ছে ওরা? অদ্ভুত ইচ্ছা। অদ্ভুত কেন? পরদা নেই, প্রকট ধ্বংস এখন; এখন সে আর পর না, এদের আপন।

তাই সোমেন বললো, 'যা গেছে তা গেছেই। তাব'লে অন্য উপায় কি হবে না।'

'দেখা যাক,' মালতী নিশ্বাস ফেললো।

'আপনার কিছু সুবিধে হ'লো এর মধ্যে?'

'তেমন আর কোথায়,' রোগা হাসি ফুটলো মালতীর ঠোঁটে।

'ট্যুশনি একটা তো পেয়েছেন?'

'একটাই।'

'কত দেয় সেখানে?'

'তিরিশ টাকা।'

'আর-একটার না খোঁজ পেয়েছিলেন ?'

'সেটা হ'লো না।'

'আর কোথাও কিছু ?'

'চেষ্টা তো করছি। রেডিওতে গিয়েছিলাম, দু-একটা ফিল্মস্টুডিওতেও, কিন্তু—' কথা শেষ করলো না, দরকার নেই।

একটু ফাঁক দিয়ে সোমেন বললো, 'মাসে অন্তত দেড়শো টাকা তো চাই আপনার।'

'একশোতেও চালাতে পারি।'

'একশোতে ? বাড়িভাড়াই চল্লিশ !'

মালতী কথা না-ব'লে তাকালো। প্রশ্ন, চোখের কাঁপা-কাঁপা প্রশ্ন সোমেনের সামনে। সম্ভব না, এর পর বলা সম্ভব না যে সে কিছুই পারেনি, পারে না। পারে, সবই পারে। না-ই বা তার আশ্রয় থাকলো কোথাও, সে-তো অন্যের আশ্রয় হয়েছে এইমাত্র; আর আশ্রয় যাকে দিয়েছে, শক্তিও পেয়েছে তার কাছেই। মুহূর্তে সব বদলে গেছে।

মুখে হাসি এনে সোমেন বললো, 'আমার একটা কথা শুনবেন ?'

'বলুন।'

'আপনি অত ভাববেন না। আমি তো আছি !'

মালতী বোধহয় কিছু বলতে গিয়ে বলতে পারলো না। তার গালের পেশী কাঁপলো, চোখের পাতা চোখের উপর নামলো, নিচু মাথায় মাথার কাপড় খসলো। কম-বয়সী দেখালো, কুমারী, ছিপছিপে, অপেক্ষায় চুপ।

অংশু ফস্ক ঘরে এলো। যেমন গিয়েছিলো, তেমনি নিয়ে এলো হাতে ক'রে যার-যার থালা-গেলাশ। পরিষ্কার ধুয়ে এনেছে। তাদের

দিকে একটু তাকিয়ে থেকে সোমেন বললো, 'চমৎকার ছেলে দুটি আপনার।'

আবার রোগা হাসি ভাসলো মালতীর ঠোঁটে। নামলো চুপ। এবার অংশু ফন্তু দু-জনেই বসলো জড়োসড়ো হ'য়ে তক্তাপোশের কোণে। এরা কিছু জানে না, কিন্তু মা-র মুখে-চোখে কিছু কি দেখেছে? হয়তো না, দুঃখের অভ্যাস বোবা ক'রে দিয়েছে মালতী সেনের চোখ-মুখ; আমারও তো আজ দেখে কিছু মনে হয়নি।

সোমেন চেয়ার ছেড়ে উঠলো।

'যাচ্ছেন?'

'আজ যাই। আমি সোমবার সন্ধেবেলা আসবো। একটু থেমে সোমেন আবার বললো, 'ভাববেন না।'

একটু দেরি ক'রে আস্তে উঠলো মালতী, কাগজমোড়া প্যাকেটটা হাতে তুললো। হাত বাড়িয়ে বললো, 'এটা—'

কত ভেবেছিলো, কিন্তু গণেশ ব্যাঙ্ক ফেল প'ড়ে সহজ ক'রে দিয়েছে। সোমেন বললো, 'ওটা আপনার জন্যই এনেছিলাম।'

'আমার জন্য?' মালতীর কপালে যেন ছায়া পড়লো, চোখের কোণ কুঁচকোলো একটু।

'আপনার নতুন একটা ব্যাগ দরকার। নানা জায়গায় যেতে হয়।'

'এটা ব্যাগ?'

'দেখুন তো কেমন।'

মালতী আস্তে টেনে বের করলো বইয়ের মতো ভাঁজ-করা কচি-পাতা রঙের হাতব্যাগ। সেটার দিকেই তাকিয়ে বললো, 'কেন আনলেন?'

সোমেন বললো, 'আপনার কাজে লাগবে না?'

মালতী কথা বললো না, ব্যাগটা হাতে ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকলো; দোকানের নাম-ছাপানো খাকি খামটা খ'সে পড়লো মেঝেতে।

সোমেন বললো, 'যাই।'

মালতী চোখ তুললো, চোখে-চোখে দেখা হ'লো। না, বোবা না; হতাশারও ভাষা আছে।

৪

রাত বাড়লো; সারাদিনের বেঁচে থাকার পরে কয়েক ঘণ্টার ছুটির সময় কাছে এলো। কলকাতার ঘরে-ঘরে তৈরি হচ্ছে সবাই— অনেকেই।

ইজিচেয়ারে ব'সে বই পড়ছে সোমেন। বইটা রিলকের চিঠিপত্র। সে নিজে আর বই কিনতে পারে না আজকাল; তবে তার প্রথম জীবনের সাহিত্যিক বন্ধুদের দু-একজনের এখনো অবস্থাও স্বচ্ছল, মনও জীবন্ত; তাদের কাছে ধার পায় মাঝে-মাঝে। আশ্চর্য চিঠি লিখেছেন এই জর্মন কবি। কবিতা লেখার কথায় বলছেন: 'লিখতে না-পেলে তোমাকে কি মরতে হবে? প্রথমেই এই: তোমার রাত্রির নিভৃততম মুহূর্তে নিজেকে প্রশ্ন করো: লিখতেই হবে আমাকে? এর গভীর উত্তর খুঁড়ে আনো নিজের ভিতর থেকে। আর যদি এই গম্ভীর জিজ্ঞাসার উত্তরে সহজে, সজোরে বলতে পারো, "হ্যাঁ—"'

আমি কি তা বলতে পারি? আমি কি নিজেকে এ-প্রশ্ন করেছি কখনো? কবিতা লিখতে না-পেলে আমি কি সত্যি ম'রে যাবো? তার মনের বাঁকে-বাঁকে কবিতার চলাফেরায় কান পাতলো সোমেন, তখনই সেপাইমতো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলো কয়েকটা শব্দ, একটা লাইন। কড়া মনিব: ছাড়ে না কক্খনো। কে মনিব? ওরা? না, আমি? আমি। আমি আরো কড়া। আমি ওদের আটকে রাখবো দিনের পর দিন; পরখ হোক ওদের শক্তির: কত বাধা ডিঙোতে পারে, কত বাঁধ ভাঙতে পারে।

'—যদি বলতে পারো, "আমাকে লিখতেই হবে", তাহ'লে এই বাধ্যতার অনুপাতে নিজের জীবন রচনা করো; তুচ্ছতম, নগণ্যতম মুহূর্তেও তোমার জীবন এই প্রেরণার চিহ্ন হোক, সাক্ষী হোক। সেটা হওয়াই চাই।'

তা কী ক'রে হ'তে পারে? জীবন—বর্তমান জীবন—কবিতার শত্রু তো। মহাশত্রু। জীবন মানে বেঁচে থাকা; বেঁচে থাকা মানে জীবিকা। খাদ্য, গৃহ, স্ত্রী, সন্তান। শিল্পীর স্বভাবে সন্ন্যাস নেই; সবই চাই তার। পাবে কোথায়? বাঁচবে কী ক'রে? রিলকের নিজের জীবনটা মনে পড়লো সোমেনের, একবার পড়েছিলো কোথায়। বিয়ে করেছিলেন—একটি কন্যাও জন্মেছিলো?—কিন্তু তার পরেই জীবনের মতো বিচ্ছেদ। ঘুরে-ঘুরে একা-জীবন কাটিয়েছেন কখনো প্যারিসে, কখনো ইটালিতে জর্মনিতে, হয় রোদ্যাঁর আশ্রয়ে, নয় কোনো ধনী গৃহিণীর আতিথ্যে। তখনো ধনী ছিলো ইওরোপে, আর নীল রক্ত সমস্তটাই তখনো লাল হ'য়ে যায়নি। কী-রকম জীবন? মন্দ কী, কবিতা লিখতে পেরেছিলেন তো। এঁর তো ভালোই: কত কবি, শিল্পী, প্রতিভাবান হৃদয়বান মানুষ, পশ্চিমী দেশে ছারখার হ'য়ে গেছে এই কারণে, কেউ তাদের চায় না ব'লে, বেঁচে থাকার কাজের সঙ্গে নিজের কাজ কিছুতেই মেলে না ব'লে। ছিটকে পড়েছে আফ্রিকায় মেক্সিকোয় টাহিটিদ্বীপে, ডুবেছে নেশায়, গলা কেটেছে ক্ষুর দিয়ে, জঘন্য রোগে পচেছে। তবু লিখতে হবে? আঁকতে হবে? এতই জরুরি? এতই জরুরি। নয়তো—কেন? কিন্তু আমাদের দেশে তাও চলে না, বিয়ে ক'রে ঘরকন্নাই এখনো একমাত্র। আমি কি এখন পারি স্ত্রীপুত্র ফেলে উধাও হ'তে? যদি-বা পারি, কাছাকাছি জায়গা কোথায়? বর্মা জ্বলছে, বালি জাভা পুড়ছে।

বাকি রইলো মণিপুর, সাঁওতাল পরগণা। আরো ভালো মধ্যভারতের ঘনবনের আদিমরা।···কিন্তু বোকা হ'য়ে যাবে তো। না, কোথাও না। কোথাও যাবে না, গলিতেই থাকবে।

গলিতেই ভালো। জীবনের সমস্তটাই ভোগো : তা-ই থেকে শেখো। ইস্ক্রুপটা পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ঢুকে যাক : কথা বোলো না। শিল্পী তুমি; সবই তোমার কাজে লাগে। কবিতার সঙ্গে জীবন-যে মেলে না, সেটাই তো ভালো। বিরোধের ফলে দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বের ফলে জটিলতা, জটিলতার ফলে সমৃদ্ধি। রিলক ভুল বলেছেন কথাটা। না, ভুল বলেননি। এই তো আছে।

'—তোমার দৈনন্দিন জীবন যদি তোমার দরিদ্র মনে হয়, তাকে দোষ দিয়ো না, দোষ দাও নিজেকে এই ব'লে যে তুমিই ততটা কবি নও যাতে তার সম্পদ তলব করতে পারো। কেননা স্রষ্টার কাছে কোনো দারিদ্র্য নেই, কোনো স্থানই নগণ্য কি দরিদ্র নয়। তুমি যদি কারাগারেও থাকো, যার দেয়াল পেরিয়ে পৃথিবীর কোনো শব্দই তোমার চেতনায় পৌঁছয় না, তবু-তো—'

তবু-তো?···ভাবো না এজরা পাউণ্ডের কথা। বন্দী ক'রে খাঁচায় রেখেছিলো, বরফ-চাপা তাঁবুতে, লেখা থামেনি। পাগলা-গারদে : তবু থামলো না। কে পাগল জানি না : যাকে রেখেছে, না যারা রেখেছে। আমি পারতাম?

মীরা ঘরে এসে বললো, 'বাপ্পিটা এতক্ষণে ঘুমোলো। কী-যে মা-আঁকড়ানো স্বভাব ওর!'

সোমেন বললো, 'ওকে কাছে শোওয়ালেই পারো।'

'হ্যাঃ!'

সোমেনের চোখ বইয়ের পাতায় ফিরলো, কিন্তু এজরা পাউণ্ডের

কথাই মনে পড়লো আবার। আমি হ'লে পারতাম? এ-প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে সাহস হয় না। দুঃখ সমৃদ্ধ করে, কিন্তু দুঃখের একটা সীমা চাই। সীমা পেরোলে ধ্বংস। এ-জীবন আর কতকাল সইতে পারবেন এজরা পাউণ্ড? যুদ্ধে যারা মরলো না, দুর্ভিক্ষে যারা টিঁকলো, এবার তাদের পালা। দুটি ছেলে নিয়ে মালতী সেনকে ধ্বংস করার চক্রান্ত চলেছে কলকাতা-দিল্লি-লণ্ডন-মস্কো-ওয়াশিংটন জুড়ে। সোমবার সন্ধেবেলা। মাঝে দুটো আস্ত দিন। চলবে তো? ব্যাঙ্কে গিয়েছিলো তো আজই সকালে? তার মানে—

'শোনো।'

সোমেন চোখ তুললো। দরজা বন্ধ ক'রে বিছানায় উঠেছে মীরা, তার শোবার আগের প্রসাধন একটু-যেন ক্ষিপ্র আজ? খাটের ধার ঘেঁষে বসেছে পুরুষের মতো আসনপিঁড়ি হ'য়ে, কপাল থেকে টান ক'রে চুল তোলা, পিঠ-কাটা ফিতে-শেমিজের উপর শাদাডোরা ফিকেনীল শাড়ির আঁচল জড়ানো। তার চিক্কণ সুস্ফুট মুখের দিকে সোমেন তাকালো, তার সুস্ফুট, সমর্থ বুকের দিকে সোমেন তাকালো। শরীরের তোয়াজ করেছে মীরা: শরীরের নেমকহারামির সময় এখনো আসেনি।

মীরা বললো, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'বলো।'

'বইটা রাখো। দরকারি কথা।'

বইয়ের ফাঁকে আঙুল রেখে সোমেন খাড়া পিঠে বসলো।

একটু দেরি ক'রে মীরা বললো, 'আমি একটা জমি পেয়েছি।'

'জমি?'

'হ্যাঁ, জমি। এই কলকাতাতেই। বিনিপয়সায় পেয়েছি।'

সোমেন আবার পিঠ এলিয়ে দিলো। 'আর-কিছু পাওনি? সোনার খনি-টনি কোনো?'

পুষ্ট ঠোঁটে হাসি টেনে মীরা বললো, 'এর-বেশি সোনার খনি আর কী? কলকাতার আশে-পাশে এক ছিটেও মাটি কি এখন পাবে কোথাও।'

সোমেন হাত তুলে মাথার এক গোছা চুল আঙুলে জড়ালো।

'তোমার যেন উৎসাহ নেই? কিছু জিগেস করছো না?'

'বলো শুনি।'

'ঘুঘুডাঙার নতুন কলোনির খবর তো শুনেছো—'

'ঘুঘুডাঙা?'

'নামও শোনোনি?'

'বিখ্যাত নাকি জায়গাটা?'

'এখন বিখ্যাত বইকি। ছাখোনি কাগজে?'

'না তো।'

'তুমি তো এখনো ইংরেজের গোলাম আছো, স্টেটসম্যান ছাড়া কিছু পড়ো না। দেশের খবর কী ক'রে জানবে।'

সোমেন চুলের গোছাটা ছেড়ে দিলো।

'যাদবপুর ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণে ঘুঘুডাঙা,' ব'লে মীরা থামলো।

সোমেন বললো, 'ও।'

'বিরাট মাঠ, পেটানো জমি, আর কী চওড়া-চওড়া চকচকে রাস্তা! যুদ্ধের সময় আমেরিকানরা নিয়েছিলো কিনা। জায়গা চমৎকার!'

'তুমি সেখানে গিয়েছিলে?'

'কালও গিয়েছিলাম। কত লোক ব'সে গেছে এরই মধ্যে,

দোকান-টোকানও হয়েছে, বাস্ চলবে শিগগিরই। আমার একটা কর্নার-প্লটের উপর ঝোঁক ছিলো, আজ দাদা বললেন সেটাই উঠেছে আমার নামে। ওঃ, রোথের জমি!'

সোমেন জিগেস করলো, 'লটারি নাকি?'

'হরিবোল! লটারি কেন—গবর্মেণ্ট থেকে দিচ্ছে!'

'দিয়ে দিচ্ছে?'

'পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের দিয়ে দিচ্ছে।'

'মানে—রিফিউজিদের?' সোমেন আবার পিঠ খাড়া করলো।

'আহা—রিফিউজি ব'লে আবার আলাদা কী আছে? আমরা যারা পূর্ববঙ্গের, আমরা সকলেই রিফিউজি।'

'সকলেই?'

'ভাখো গিয়ে কারা সব জমি নিয়েছে ওখানে!' মীরা ছোট্ট ক'রে হাসলো। 'ব্যারিস্টর, ডিস্ট্রিক্ট জজ, এঞ্জিনিঅর। কত মোটর জীপ দাঁড়াচ্ছে দু-বেলা।'

একটু—একটু দেরি ক'রে সোমেন বললো, শ্রীপতিবাবু নেননি?'

'দাদা? সামনের পাশাপাশি চারটে প্লটই তো দাদার। দাদার অনেকটা হাত আছে কিনা এতে—নয়তো কি আর আমি পাই!'

সোমেন দেখলো, মীরার মুখ সুখে, তৃপ্তিতে আর রাতক্রীমে চকচকে; নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলো। মীরা আবার বললো, 'তবে সক্কলের উপর টেক্কা দিয়েছে গণেশ ব্যাঙ্কের ইন্দু রায়—সে নাকি তার মা-র নামে পাঁচ বিঘে জমি আটকে রেখেছে কবে থেকেই—আর কেউ জানতোই না তখন। ভাবো তো কী অন্যায়; কত লোকের ফুটপাতে থাকার দশা, আর ঐ লক্ষপতি ইন্দু রায় একাই পাঁচ বিঘে!'

গণেশ ব্যাঙ্ক বললো না মীরা? হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছে। সোমেন

আস্তে উঠে তার লেখার টেবিলের কেজো চেয়ারে বসলো। তাকে চতুর হ'তে হবে, সতর্ক, অনুত্তেজিত। একটি সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারটি একটু ঘুরিয়ে বসলো মীরার দিকে।

মীরা বললো, 'জানো, যুদ্ধের মধ্যে এই বালিগঞ্জেই চারখানা বাড়ি কিনেছে ইন্দু রায়! তুই কেন রে ওখানে থাবলা মারতে এলি?'

সোমেন মীরার গলায় তার দাদার ভাষা শুনলো। মীরা আবার বললো, 'এদিকে এখন নাকি ওর জেল হবে শুনছি। তা জেল হ'লো তো ব'য়ে গেলো—ক'রে তো নিলো যা করার! ফিরে এসে সবই ভোগ করবে!'

আরো একটু তাকিয়ে থেকে সোমেন বললো, 'আর প্লট নেই ওখানে?'

'আ-আ-র! কত লোক মাথা খুঁড়ছে!'

'কোনোরকমেই দিতে পারেন না তোমার দাদা?'

'মনে তো হয় না। তাছাড়া দুটো প্লট নিয়ে আমরা করবোই বা কী।'

'আমি মালতী সেনের কথা ভাবছিলাম।'

'মালতী সেন?—ও, তোমার সেই বন্ধুপত্নী?' মীরা আর-কিছু বললো না।

সোমেন বললো, 'কষ্টে পড়েছেন ভদ্রমহিলা ছেলে দুটিকে নিয়ে।'

'কেন এরা সব কলকাতায় আসে তাও জানি না। ঢাকার কথা তো ভালোই শুনি আজকাল।'

'ইনি তো আগে আসেননি, আসতে চানওনি। কিন্তু ছাত্রীরা কেউ থাকলো না, তাই আসতেই হ'লো।'

'হ্যাঁ—অনেক তো ব'লে গেলো সেদিন। কিন্তু আমি ভাবি,

আমাদের আর কত সইবে? যুদ্ধ গেলো, দাঙ্গা গেলো, এবার রিফিউজির ঠেলা! কলকাতা থই-থই! আর কি জায়গা নেই বাংলাদেশে?'

সোমেন বললো, 'বাংলাদেশ তো আর নেই। এখন-তো পশ্চিম বঙ্গ।'

'তা যদি বলো, দেশে কলকাতা ছাড়া আর আছেই বা কী। যা এক-একখানা নমুনা আমদানি হচ্ছে!'

সোমেন সিগারেটে টান দিলো। 'মালতী সেনকে একবার দেখে এলে পারতে। ক-দিন তো এসেছে—'

'আমার সময় কই!' মীরার গলায় যেন কচ্ ক'রে কাঁচির আওয়াজ হ'লো।

'না—বার-বার বলেছিলো কিনা।'

'তোমাকেও তো বলেছিলো। না-হয় তুমিই একদিন একটু কষ্ট ক'রে কর্তব্যটা সেরে আসতে। সবই আমার উপরে চাপাবে!'

কেন মীরাকে বলিনি? কী জানি কেন। জানবে না কেন—ঠিক জানো—মানুষের মন নিয়ে বই লেখো তুমি, আর নিজের মন জানো না! যেন ঠিক সময় হ'লো না, সুযোগ হ'লো না বলার: আর মীরাও তো মালতী সেনের খবর জানতে ব্যস্ত না। তবু, বলা উচিত। এখন তো কথা উঠেছে, সুযোগ হয়েছে: বলবে? থাক। তার সবই তো বিক্রি হ'য়ে গেছে স্ত্রীর কাছে, সংসারের, সমাজের কাছে, এই একটা থাক তার নিজের, একলার। খুব ছোটো এটা, তুচ্ছ: কারো কোনো ক্ষতি হবে না।

'কিছু বলছো না যে?'

মীরা কি আরো কিছু বলেছিলো? কী বলেছিলো?

মীরার চোখ সরু হ'লো সোমেনের মুখের উপর। 'তুমি কি আমার কথা শুনছো না?'

সোমেনকে বলতে হ'লো, 'কী বলছিলে ?'

'মন দাও, সংসারে মন দাও এবার ! প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করলেই হ'লো না মশাই, তারপর আরো আছে !'

'একবার বলবে নাকি তোমার দাদাকে ?' সোমেন এই ফাঁকটুকু আঁকড়ালো, 'খুব ছোটো একটা বাক্সে প্লটও যদি—'

'ও ব'লে কিছু হবে না—'

মীরা শেষ করেনি, কিন্তু সোমেন তখনই আবার বললো, 'হ'লে বড়ো ভালো হ'তো। কিছু নেই মালতী সেনের, কাউকে চেনে না এখানে।' তাড়াতাড়ি জুড়লো, 'সেদিন কথা শুনে তা-ই মনে হ'লো না ?'

'আরে গলা যত শুকোয় আসলে কি আব তত ? কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা নিয়ে এক-একজন এসেছে না—এদিকে ঠেশে স্থবিধে নিচ্ছে গবর্মেন্টের কাছে ! র‍্যাশন পর্যন্ত ফ্রী !'

সোমেন হাত বাড়িয়ে রিলকের বইটা টেবিলে রাখলো। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আস্তে বললো, 'তাহ'লে আর কথা কী। খাওয়াও ফ্রী, শেয়ালদার প্ল্যাটফর্মে কোয়ার্টার্সও ফ্রী। আছে ভালো।'

মীরার চোখ দুটি সরু হ'য়ে সোমেনের মুখের উপর স্থির হ'লো। তার কথারই সুর নকল ক'রে চিবিয়ে-চিবিয়ে জবাব দিলো, 'নিজের সংস্থান থাকলে তবেই অন্যকে দয়া করা যায়, বুঝেছো ?'

এটুকু ব'লেই মীরা থামলো। সোমেন তাকালো তার দিকে : একটা মশা তার নাকের কাছে উড়ছে।

মীরা বসার ভঙ্গি বদল করলো। মেঝেতে পা ঝুলিয়ে দিলো, একটি হাত রাখলো খাটের মাথার গোল-করা কাঠে। তার চিক্কণ গোল বাহুর উপর মশাটা একবার ব'সেই উড়ে গেলো।

'শোনো এবার। ওখানে কিছু তুলতে হবে কিন্তু এখনই।'

এখনই? মীরা বলছে কী? আঙুলে-ধরা ছোটো-হওয়া সিগারেটটার দিকে তাকিয়ে সোমেন বললো, 'তা—'

'ও-সব তা-টার সময় নেই। ব্যবস্থা দাদাই ক'রে দেবেন, দেখাশোনাও আমি করবো, কিন্তু টাকা তো তোমাকেই দিতে হবে।'

'কত? হাজার কুড়ি হ'লে হবে?' সোমেন ঠোঁটের কোণে হাসলো।

'ও-সব পরের কথা,' মীরার অবিচল গলায় সোমেনের কৌতুকের চেষ্টা পিষে গেলো। 'এখন তো আর সত্যিই কেউ বাড়ি তুলছে না।'

'তুলছে না?'

'আপাতত যা-হোক একটা ঘর-টর তুলে জমিটা আটকে রাখা দিয়ে কথা।'

'আটকে রাখা মানে?'

'ও—:, কিচ্ছু যদি বোঝো তুমি! এক্ষুনি কিছু না-তুললেই অন্যকে দিয়ে দেবে—অন্য-কেউ দখল ক'রে বসলেই বা কথা কী। সব-তো বাস্তুহারা! শেষের কথাটায় রম্য ঠোঁটে বাঁকা হাসলো মীরা।

সোমেনের আঙুলে গরম লাগলো। সিগারেট পুড়তে-পুড়তে—ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, আঙুলের কড়ায় আঙুল ঘ'ষে সোজা পিঠের কেজো চেয়ারটিতে বসলো। ও-চেয়ারটায় নিজেকে নিরাপদ লাগে তার, যেন জোর পায়। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'তাহ'লে ঘর তুলবে?'

'মাটির ঘর। গবর্মেণ্টের বিনিপয়সার জমিতে মস্ত বাড়ি হাঁকড়ালে ভালো তো দেখায় না হঠাৎ, তাই সকলেই মাটির ঘর তুলছে আপাতত, বাজে লোকেরা টিনের—; কিন্তু আমার কাছাকাছি ভালো-ভালো ভদ্রলোকই সব।'

'ভালো-ভালো ভদ্রলোকরাও থাকছেন সেখানে?'

'নিজেরা আর কী ক'রে থাকবে। কোনো গরীব আত্মীয়কে কি চাকর-বাকর কাউকে লোক-দেখানো থাকতে দিচ্ছে এখন—অবশ্য পাকিস্তানের আমদানিরা নিজেরাই আছে।'

'পাকিস্তানের আমদানিও কেউ-কেউ আছে তাহ'লে?'

'হ্যাঃ, ঐ যা একটু খুঁত ঘুঘুডাঙার। যা-সব—!' মীরা একটু থামলো। 'আমি কাকে থাকতে দেবো তা-ই ভাবছি।'

সোমেন আলগোছে বললো, 'মালতী সেন থাকতে পারে।'

'কেন? হঠাৎ মালতী সেন কেন?'

'বড্ড দরকার ওঁর।' ব'লেই সোমেন ভাবলো, ভুল বললাম। সত্য বড়ো সোজা; ওতে কাজ হয় না। বাঁকা পথে কাজ।

'দরকা-র!' মীরার গলায় ছোট্ট ঢেউ দিলো। 'দরকার কার না?'

'থাকতে তো দেবেই কাউকে; উনি থাকলে আমাদের ক্ষতি কী। আর তাছাড়া,' সোমেনের গলা তার অনিচ্ছায় আগ্রহে ভ'রে উঠলো, 'থাকবার একটা জায়গা হ'লে ভদ্রমহিলা হয়তো কোনোরকমে—'

'ভদ্রমহিলাটির বিষয়ে তুমি যেন খুব ইন্টারেস্টেড?'

সোমেন কুঁকড়ে চুপ করলো। এ-অস্ত্র মীরা ছাড়বে, জানাই জানা। কিন্তু এরও জবাব আছে। বলো না, জোর ক'রে বলো! কী বলবে? সত্যের সরল পথ সে তো নেয়নি। যদি সে প্রথম থেকেই মীরাকে সব বলতো, আজকের ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার ঘটনা পর্যন্ত, তাহ'লে হয়তো···দয়া নিতে ভালো না, কিন্তু দিতে কার না ভালো লাগে। এখন? আর হয় না।

'মালতী সেনের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিলো নাকি আবার?'

সোমেন একটু অবাক হ'লো প্রশ্ন শুনে। নির্ভুল ইনস্টিংক্ট!

একবার চুলে হাত বুলিয়ে জবাব দিলো, 'আমার? না তো।' নিজের গলা অন্য রকম শুনলো, কেমন সহজ, প্রায় উদাস আওয়াজ। প্রথমটার পরে দ্বিতীয় মিথ্যাই এত সোজা? আড়চোখে একবার স্ত্রীর মুখ দেখে নিয়ে বললো, 'তেমন আর কাউকে মনেও পড়ছে না, তাই—'

'তোমার টালিগঞ্জের দিদিমাকে বলো না। ছেলে-বৌয়ের হাড় জুড়োক, বুড়িও মরার আগে হাঁফ ছাড়ুক।'

সোমেন কথা বললো না। তার বুকের মধ্যে বড়ো-বড়ো গোপন নিশ্বাস পড়ছে, যেন শরীরের কোনো শ্রম ক'রে উঠলো।

'আর তা নয়তো আমার মেজো-পিসিমার ভাসুরকেও বলতে পারি, কিন্তু তাকে আবার দাদার দরকার।' মীরা একটু ভাবলো। 'আচ্ছা হোক তো আগে,' ব'লে সোমেনের মুখের উপর চোখ রাখলো।

সোমেন চুপ ক'রে তাকালো। মীরার মুখের কাছে মশাটা ঘুরছে। মনে পড়লো তাদের পদ্ম স্নোর একটা বিজ্ঞাপন: ছবিতে মেয়েটির মুখের কাছে ভোমরা উড়ছে, তলায় ক্যাপশন—পদ্মসম গন্ধ, ভ্রমর ছোটে অন্ধ। পদ্যটা তারই লেখা—এ-ই চাকরি। ··মশারা গন্ধ পায়?

'আমি এখন বেশি কিছু করবো না, স্রেফ একটি ঘর। পাঁচশো টাকাতেই কুলিয়ে যাবে তোমার। টাকা কিন্তু সাত দিনের মধ্যে চাই।' কথা শেষ ক'রে স্বামীকে চোখে আটকালো মীরা। সোমেন পালালো, চোখ নামালো মেঝেতে, আলতা-আঁকা ফর্শা পা দুটিতে।

মীরা বললো, 'ভাবছো কী? এই পাঁচশো টাকা তোমার যে ক'রে হোক উঠে আসবে। আরে এই রিফিউজি নিয়ে হৈ-চৈ আর ক-দিন!—তারপর যে যার ইচ্ছেমতো সবই করবে। আর যদি এমন হয়—আঃ, তাকাও না, মুখ না-দেখলে কথা বলা যায়?'

সোমেন বাধ্য হ'লো, মুখ তুললো।

'—যদি এমন হয় যে বাড়ি করতে শেষ পর্যন্ত আমরা পারলামই না, তাহ'লে যে-কেউ লুফে নেবে বলামাত্র। পাঁচশো টাকার অনেক গুণ ফিরে পাবে তখন।' 'অনেক গুণ' কথাটায় মীরার চোখের তারা নাচলো। 'যাক না ক-টা বছর—ছাখো না—এই বালিগঞ্জের উপরেও টেক্কা দেবে গান্ধীগ্রাম।'

গান্ধীগ্রাম! সোমেন একটু দম আটকে থাকলো। সেই শীতের সন্ধ্যায় বোকার মতো রাস্তায় ঘুরছিলো, হঠাৎ কানে এলো, 'গৌদোটা গেলো তাহ'লে? বাঁচা গেলো।' সোমেন একটু থমকে তাকিয়েছিলো, মুখ চিনলো। নামজাদা ব্যক্তি, মহামান্য, পরের দিন দশটা শোকসভায় প্রিজাইড করলেন। বেচারা গান্ধী! নামটা ছাড়বে না কিছুতেই!

'একদিন দেখে এসো না গিয়ে—ভালো লাগবে তোমার। বুকটান জমি, খাঁ-খাঁ খোলা, আমার প্লটে আবার একটা আমগাছও—' বলতে-বলতে খুশি উপচোলো মীরার গলায়। 'আমি ভাবছি—' চট!—'ছাখো, শীত না-পড়তেই মশা। এদিকে মশারি শতছিন্ন।'

সোমেন দেখলো মীরার পিঙ্ক রঙের হাতের তেলোয় আলতা-লাল ছিটে, পাশেই কালচে দাগ—মশার থ্যাৎলানো শব। কার রক্ত খেয়েছিলো? রংটা টকটকে তাজা—, মীরার।

মাথার চুলে হাত মুছে মীরা বললো, 'আমি ভাবছি ঘর তুলেই ভাড়া দিয়ে দেবো।'

'ভাড়া?'

'চাইকি পঁচিশ টাকাতেও ভাড়া দিতে পারি। পাঁচশো টাকা খরচ ক'রে মাসে পঁচিশ টাকার বন্দোবস্ত! আর কী চাও?' শেষের

কথাটায় যেন প্রণয়ের তাপ উঠলো, আধো-হাসিতে ঈষৎ খুলে গেলো ঠোঁট দুটি।

নিঃশব্দে তাকিয়ে থামলো সোমেন। অবাক হবার কিছু নেই, অবাক-হওয়া শেষ হ'য়ে গেছে। দশ বছর, পাঁচ বছর আগেও—তখনো ভাণ ছিলো পৃথিবীতে, মানুষ লুকিয়ে চুরি করতো, ধরা পড়লে লজ্জা পেতো। লজ্জা আর নেই, কপটতার লৌকিকতাও ফেরার। যুদ্ধ সবা বদলে দিয়েছে।

৫

'এখন টাকাটা আমাকে এনে দাও চটপট।'

কথায় একটু ফাঁক দিয়েছিলো মীরা—চার কি পাঁচ সেকেণ্ডের বেশি না, কিন্তু সোমেনের মনে হচ্ছিলো অনেকক্ষণ, প্রায় সে ভাবছিলো কথা ফুরিয়েছে, মীরা এখনই শুয়ে প'ড়ে তাকে আলো নেবাতে বলবে। যা নিয়ে এতক্ষণ কথা হচ্ছিলো তাও সে-মুহূর্তে তার মনের মেঝে লুকিয়েছিলো, তাই না-বুঝে বললো, 'টাকা ?'

মীরার চোখের নাচুনি তারা দুটি স্থির হ'য়ে যেন আরো চকচকে হ'লো। একটু ভারি গলায় সেই কথাটাই আবার বললো, 'এখন আমাকে টাকাটা এনে দাও চটপট।'

সোমেন চেয়ারে একটু ন'ড়ে বসলো, সিগারেট ধরিয়ে পোড়া দেশলাইয়ের ধোঁয়া-ওঠা ডগার দিকে একটু তাকালো, সেটা কালো হ'য়ে নেতিয়ে পড়ার আগেই নিপুণ হাতে ছাইদানে ফেললো। তার প্রতিটি কাজে, কথা বলার প্রত্যেক অণুপলের দেরিতে মীরার মেজাজ বিগড়োচ্ছে : ভাবতে ভয় করছিলো তার, আবার মজাও লাগছিলো। যা চেয়েছিলো হ'লো না, হবে না। জোচ্চোরিতে সায় দিলেও মালতী সেনের কাজে লাগবে না। অতএব এসো বিবেক, দুর্বলের শেষ আশ্রয়।

সোমেন বললো, 'টাকা আমি কোথায় পাবো ?'

'কোথায় পাবে মানে ?'

'মানে—টাকা আমার নেই, এই আরকি।'

মীরা খাটে পা মুড়ে বসলো, কোলে একটা বালিশ নিয়ে বালিশের উপর দু-হাত ভাঁজ করলো। সোমেন মনে-মনে তৈরি হ'লো।

'টাকা তোমার নেই তা জানি; জানি ব'লেই বলছি, এই টাকাটা এখন না হ'লেই চলবে না। তোমার সমস্ত ভবিষ্যতের সংস্থান ঘুঘুডাঙার ঐ এক টুকরো জমিতে: তা তুমি বোঝো?'

মোটে ঐটুকু আমার ভবিষ্যৎ? হাসি ফুটছিলো সোমেনের ঠোঁটে, চেপে গিয়ে বললো, 'কিন্তু এক্ষুনি পাঁচশো টাকা—'

'এক্ষুনি তো না, সাত দিন সময় আছে। তুমি নাকি দেশের মধ্যে একজন নামজাদা লেখক, আর পাঁচশো টাকা তোমার জোটে না?'

জোটে নাকি?

সোমেনের না-বলা কথাটা মীরা বুঝতে পেরে উপায় ব'লে দিলো, 'পাব্লিশারদের কাছে কিছু পাওনা নেই তোমার?'

'না। ধার আছে একজনের কাছে।'

'ঐ তো! ধার করতে পারো।'

'আর পারি না। যেখান থেকে যতটা সম্ভব, হ'য়ে গেছে। ইনশিওরেন্স বলো, প্রভিডেন্ট ফণ্ড বলো—'

সোমেনের ঋণের লিস্টি শেষ হ'লো না, মীরার চড়া গলা ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর। 'শুনতে চাই না ও-সব। টাকা চাই!'

সোমেন সিগারেটে টান দিলো। একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'এক্ষুনি ঘর তোলা না-হ'লে জমিটা কি ফশকেই যাবে?'

'নির্ঘাৎ!'

'তবে তো তা-ই ভালো।'

'তা-ই ভালো?' মীরা একবার জোরে নিশ্বাস নিয়ে আবার বললে। 'তা-ই ভালো?'

'আমরা তো পেতেই পারি না। আমরা কি রিফিউজি ?'

বিদ্বেষ জ্ব'লে উঠলো মীরার চোখে। ঠোঁটে ঠোঁট চাপলো, ক্রোধ পিষে দিলো ঠোঁটের ফাঁকে। সোমেন তার সংযমের তারিফ করলো।

নিবিড় নিচু গলায় মীরা বললো, 'কেন নই ? তোমার দেশ ঢাকায় না ?'

আমার দেশ ? কোথায় ?

'এখন আর আমার সঙ্গে ঢাকার কী। কোন জন্মে ছেড়েছি।'

'কিন্তু দেশ তো ঢাকায়। পাকিস্তানে। তার মানে—তুমিও একজন পাকিস্তানি বাস্তুহারা!'

'হ্যা—গণেশ ব্যাঙ্কের ইন্দু রায়ও পাকিস্তানি, অতএব বাস্তুহারা।'

মীরার গলার নীলচে একটি শিরা ঈষৎ ফুলে উঠে ডুবে গেলো। এবারেও রাশ টেনে বললো, 'ইন্দু রায়ের কথা জানি না, তবে তুমি বাস্তুহারা তাতে সন্দেহ কী। লোকের একটা গ্রামের বাড়িও থাকে, তোমার কি তাও আছে ?'

'কোনোকালেই ছিলো না।'

'বেশ, তোমার না ছিলো আমার ছিলো। আমার বাপের বাড়িও ঢাকায়, সে-কথা ভুলো না।'

সোমেন বললো, 'মনে করিয়ে দিয়ে ভালো করলে।'

মীরার নিখুঁত নাকটিকে ঘিরে হঠাৎ কয়েকটা কুশ্রী রেখা নামলো। 'তাতে কী ? না হয় যাইনি কোনোদিন,' বলতে-বলতে গলা চড়লো তার, 'তাই ব'লে তোমার মতো অমানুষ নই যে দেশকে দেশ বলতে লজ্জা করে! আমার বাবা ঢাকা থেকেই এসেছিলেন, লোহজঙের কাছে কোথায় যেন আমাদের বাড়ি আছে এখনো, জমিজমাও ছিলো

শুনেছি। সে-সবের খেশারৎ আদায় করতে আমরা পারি বইকি—আদায় ক'রে ছাড়বো!'

'আমি হেরে যাবো, আমি হেরে গেলাম, তবু যুক্তিতে হারাবার শুকনো সুখটুকু তো আছে এখনো। সোমেন তাই বললো, 'তোমরা মানে—তোমার দাদা?'

'আমি নই কেন? দাদা যেমন বাবার এক ছেলে, আমিও তেমনি বাবার একমাত্র আদরের মেয়েই—ছিলাম। সব সময় বলতেন হাবুকে আর ময়নাকে আমি সমান-সমান দিয়ে যাবো সব। হঠাৎ মারা গেলেন, নয়তো—' মীরা নিশ্বাস ফেলে বললো, 'তোমার হাতে বাবা আমাকে দিয়েছিলেন সে কি আর তোমার ভরসায়?'

হাতে দিয়েছিলেন? কিন্তু তাই হয়তো মীরা ভাবে এখন, হয়তো নিজের মনেও মানতে চায় না যে সে নিজেই হাত বাড়িয়ে নিজের দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছিলো বারো বছর আগে। আমি তাকে ভুলিয়েছিলাম, তার যৌবন তাকে ঠকিয়েছিলো। মাথা যারা ঠাণ্ডা রাখে, তারাই জেতে।

'আজ যদি বাবা থাকতেন তাহ'লে কি আব টাকার জন্য আমাকে ধন্না দিতে হয় তোমার কাছে!' 'তোমার' কথাটায় অবজ্ঞার জোর পড়লো—ঠিক জোর না, যেন ডাক্তারি ছুঁচের সূক্ষ্ম সকরুণ খোঁচা।

এই ঔষুধের উত্তেজনায় সোমেন ব'লে ফেললো, 'তুমিও তো এটা আমার ভরসায় করোনি; তাহ'লে তো আগেই বলতে আমাকে।'

'ইচ্ছে ক'রেই বলিনি!' তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে মীরা। 'বাজে কথা ব'লে বাগড়া দেবে জানি তো! আর তুমি বোঝোই বা কী এ-সবের—সংসারে টিঁকে আছো তো আমার জোরে! কিন্তু আমার হাতে সব থাকলেও টাকা তো নেই।'

'তোমার দাদা দিতে পারেন না তোমাকে?' কথাটা ভালো-মানুষের মতো বললো সোমেন, ব'লে চোর-চোখে মীরার মুখ লক্ষ্য করলো।

মীরার মুখে রং চড়লো। 'দাদা? চাইলেই দেবেন, কিন্তু চাইতে তো হবে।' মীরা একটু থেমে আবার বললো, 'বাপের সঙ্গে কি ভাইয়ের তুলনা! বৌদি মোটর হাঁকিয়ে বেড়ান, আমি টিংটিং ক'রে রিকশতে চলি। দাদার ছেলেমেয়ের নিত্যনতুন পোশাক, আর বুলবুলের স্কুলে যাবার ফ্রক থাকে না। অথচ আমিও আমার বাবারই মেয়ে। কত খারাপ আমার লাগে বোঝো না? আমার কথা কি কিচ্ছু বোঝো না তুমি?'

হঠাৎ এক ঝলকে মীরার সব কথাই সে বুঝে ফেললো। মনের তলা থেকে নিশ্বাস উঠলো: আহা! বেচারা! অসুখী মীরা! আমিও অসুখী—কিন্তু আমার প্রতিকার নেই, মীরার আছে। অতএব—

'এই টাকাটা তুমিই আমাকে দাও। আমার এটুকু সম্মান রাখো তুমি!'

এই মিনতি চাটুকারী; চাটুকারিতা প্রতারক। সোমেন চুপ ক'রে থাকলো। সে কি পারে পাঁচশো টাকা জোগাড় করতে? পারে না? চেষ্টা করো, চেষ্টা!

হ্যাঁ, সে সব পারে। কিছু ভাববেন না; আমি তো আছি। না, কিছুই পারে না। সংসারে তুমি টিঁকে আছো তো আমার জোরে। সোমবার সন্ধেবেলা আসবো। কী করবে সোমবারে? রম্য মিনতি স'রে গেলো, চোখে ভাসলো শুষ্ক মুখ। কিছু করতেই হবে। কেন? মালতী সেনের প্রয়োজন বেশি। আরো বেশি প্রয়োজন কি অন্য কারো

নেই? মীরার জমিটা অন্যায়। অন্যায় কি আমারই কম? তবে? জানি না। কিছু করতেই হবে।

মুখের উপর মীরার উষ্ণ চোখ অনুভব করলো সোমেন। শক্ত হ'লো; চোখের উৎসুকতাকে চোখের নির্জীবতা দিয়ে ঠেকিয়ে বললো, 'উপায় নেই।'

'উপায় করতে হবে।' মুহূর্তে শক্ত হ'লো মীরার মুখ, একটু আগের মৃদু স্বর এক লাফে কড়া পরদায় পৌঁছলো।

একটু থেমে সোমেন বললো, 'একটা উপায় হ'তে পারে। তোমার গয়না থেকে যদি—'

'লজ্জা করে না!' মীরা লাফিয়ে নামলো খাট থেকে, গায়ের আঁচল খ'সে পড়লো, পিঠের আঁটো মাংসে ঝিলিক দিলো ইলেকট্রিকের আলো। 'লজ্জা করলো না কথাটা মুখে আনতে। কাপুরুষ!'

মুগ্ধ হ'য়ে দেখতে লাগলো সোমেন। মীরার ফর্শা মুখ লাল, চোখ জলজ্বলে, নিচু শেমিজে অর্ধেক বেরিয়ে প'ড়ে তীব্র ওঠা-পড়া করছে পূর্ণ স্তন দুটি। নিজেকে বিচ্ছিন্ন লাগলো সোমেনের, যেন ফিল্মের কোনো দৃশ্য দেখছে। একবার কে না ভুল করেছিলো মীরাকে ফিল্মের মায়া বর্মন ব'লে? তাও-তো এ-চেহারা কেউ গ্যাখেনি।

মীরা দম নিলো, সোমেনের দিকে এগোলো। সোমেন নড়লো না, তার চোখ সরলো না; অপেক্ষা করলো।

'স্ত্রীর গয়নার উপর নজর দেয় কারা? যারা ক্লীব, অক্ষম, অধম! থাকবার মধ্যে ঐ-তো আমার সম্বল—আর আমি তা নষ্ট করবো তুমি যাতে পায়ে পা তুলে বই পড়তে পারো! ফেলে দাও বই; মাটি খোঁড়ো, মাথা খোঁড়ো, গলায় রক্ত তোলো—যেখান থেকে পারো, যেমন ক'রে পারো, নিয়ে এসো টাকা! টাকা আমার চা-ই!' একটানে

কাপড় ছেঁড়ার মতো আওয়াজ হ'লো শেষের কথাটায়। 'সাত দিনের মধ্যে—বুঝেছো?'

অস্বাভাবিক মোটা গলায় সোমেন নিজেকে বলতে শুনলো, 'আমি পারবো না।'

'পারবে না তো বেরোও—বেরোও এখান থেকে!' নগ্ন গোল সবল একটি বাহু শূন্যে লাফ দিলো, একটি ছায়া-পড়া কুক্ষির আভাস লাগলো সোমেনের চোখে। কিছু ছুঁড়ে মারলো? সোমেন মাথা নোওয়ালো, কিন্তু মীরা বেগে স'রে গেলো সেখান থেকে, যেন সে-ই দরজা খুলে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু কোথায়? এই ঘরে দু-জনেই বন্দী।

মীরা ফিরে এসে খাটে বসলো, স্তব্ধতা নামলো। এতক্ষণের এত কথার পর অদ্ভুত এই স্তব্ধতা: ব্যাপ্ত, অব্যবহিত, গভীর। যেন এ-ঘরে কেউ কোনোদিন কথা বলেনি, বলবেও না।

'সব শব্দ লুপ্ত হয়, ফুরায় এ-পৃথিবীর সব লেনদেন,
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসবার বনলতা সেন।'

কে বনলতা সেন? কেউ না। যদি সে কেউ হ'তো, তবে সে কবিতা হ'তো না।

সোমেন আস্তে উঠে বাথরুমে ঢুকলো। বাথরুম পবিত্র স্থান; মানুষ আজকাল সত্যি একা হ'তে পারে একমাত্র ঐখানে। খামকা দেরি করলো। শুকনো লাগছে, গরম, বেসিনে এলো মুখ ধুতে। একটা মোটা আরশোলা গুঁড়ি মেরে চলেছে চিনেমাটির মসৃণ ঢালুতে। সোমেন জোরে কল ছেড়ে দিলো: মরুক। আরশোলা দৌড়লো; জলের তোড়ে হোঁচট খেতে-খেতে অন্ধের মতো এঁকে-বেঁকে বেয়ে উঠলো দেয়ালে। মুখে-চোখে জল দিয়ে সোজা

হ'লো সোমেন : দেয়ালে টিকটিকি তাক ক'রে আছে আরশোলাকে। হুশ্। আরশোলা নড়লো না। সোমেন তাকিয়ে থাকলো, লম্বা ল্যাজের ডগাটুকু পর্যন্ত নিঃস্পন্দ হ'য়ে আছে নধর টিকটিকি। তার গায়ের রং নদীর চরের মতো, পেটটি ফোলা, তার চারটি পায়ে ধাঁতুরের বাচ্চার মতো পাঁচটি ক'রে ছোট্ট আঙুল তারার ছাঁচে ছড়ানো, ডলপুতুলের চোখের মতো চকচকে নীল-সবুজ তার চোখ, একটি লাল জিভের মিহি বিদ্যুৎ ঝলক দিচ্ছে থেকে-থেকে। বিদ্যুতের মতোই নেমে এলো—ত্রাক! মুখে পুরলো কপ্! ছোট্ট হাঁ-তে মস্ত শিকার ধরলো না, চেপে রাখতে গিয়ে চোয়ালে টান পড়লো, ভাবটা হ'লো দু-গালভরা হাসির মতো। মুখের রক্ত-লাল ভিতরটাও দেখতে পেলো সোমেন; অর্ধেক মুখে অর্ধেক বাইরে, ছটফট করছে জ্যান্ত আরশোলা। দেখা যাক কী ক'রে সমস্তটা গেলে। দেখা গেলো না, টিকটিকি ছুটলো খাবার-মুখে লুকোতে, ঐ মুখেরই গড়ানো রক্তের মতো দু-দিকে বেরিয়ে থাকলো লালচে মোটা আরশোলা।...ভাগ্যিশ সব প্রাণীর আওয়াজ নেই।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখলো ঘর অন্ধকার; মীরা শুয়ে পড়েছে। অন্ধকারেই কুঁজো থেকে গড়িয়ে জল খেলো, টেবিলে এসে টেবল-ল্যাম্প জেলে বই খুলে বসলো, সেই রিলকের চিঠির বইটাই। একটু পরে বিছানা থেকে আওয়াজ এলো, 'শোবে না তুমি ?'

সোমেন আলোর গলা বইয়ের কাছে নামিয়ে নিলো।

'চোখে আলো লাগছে আমার!'

সোমেন একটা বই দিয়ে মীরার দিকটা আড়াল করলো। ছায়াচ্ছন্ন বিছানা থেকে আবার উশখুশ উঠলো। নিচু নরম গলা, প্রায় আদরের মতো, সকৌতুক। 'এই কালা রাত্রে আবার বই!'

টেবল-ল্যাম্পের নিবিড় আলোয় শাদার উপর সারি-সারি কালো চিহ্নের উপর সোমেন চোখ রাখলো। যদি মীরা ঘুমুতো, যদি সে পারতো মন দিতে। কত জগৎ একই জগতে, সমান্তরাল, সমকেন্দ্রিক, সুদূর, পরস্পর; আর সমস্ত জগৎ মিলিয়ে কোনো-এক···কী?

'তুমি কি বই প'ড়েই সারা রাত কাটাবে নাকি?' হালকা হাসির হাওয়া দিলো ঝিরঝির।

সারা রাত? না, শেষ পর্যন্ত সেই শুতেই হবে। শোওয়াই থাক। সোমেন আলো নিবিয়ে উঠে পড়লো।

তার—তাদের বিছানায় একটু পরে চুড়ির মিঠে বোল রুনঠুন বাজলো। 'কী, রাগ বুঝি?'

জানলার বাইরে আকাশ। তারা চোখে পড়ে।

'একটু ভেবে দেখো। যা বলি তোমারই ভালোর জন্য বলি।'

সোমেন অন্ধকারে তাকালো। মীরা কাছে স'রে এসেছে, শুয়েছে উপুড় হ'য়ে ভাঁজ-করা বাহুতে মুখ চেপে; তার রাতখোঁপা, অন্ধকারের চেয়েও কালো, উঁচু হ'য়ে ফুটে আছে; তার নিতম্ব, ফিকেনীল শাড়িতে ঝাপসা, উঁচু হ'য়ে ফুটে আছে।

'তোমার জন্য, সবই তোমার জন্য,' ব'লে মীরা তার হাত দুটি টান ক'রে সামনে ছড়িয়ে দিলো।

সোমেন অসাড় হ'য়ে থাকলো একটু, তারপর হাত বাড়ালো। ঘৃণা রূপান্তরিত হ'লো কামে। কামুক সে; শেষ পর্যন্ত মীরারই জিৎ।

৬

ঘুম থেকে ওঠার প্রথম মুহূর্তটিতে রোজই সোমেনের সুখী লাগে। যখন ঘুম ভেঙেছে অথচ জেগেও উঠেনি, যখন আগের দিনের স্মৃতি আর আজকের দিনের চেষ্টা কোনোটাই শুরু হয়নি, সময়ের ঐ একটু অলীক থেমে-থাকাতেই বাঁচার স্বর্গসুখ। তার উপর—আধো ঘুমেও মনে পড়লো—আজ রবিবার।

কাঁচা নরম স্পর্শ পেলো শরীরে। চোখ না-খুলেই ডাকলো, 'বাপ্টি! বিনাটিন!'

বাপ্টি বাবার মুখে মুখ ঘ'ষে-ঘ'ষে খুব খানিকটা আদর করলো। 'বাবা, তোমার রোজ-রো—জ দাড়ি হয় কেন?' ব'লেই বিছানার ফাঁকা দিকটায় লম্বা গড়ান দিলো একবার, বাবার কাছে ফিরে এসে আবার বললো, 'বলো না, কেন।'

ছেলের গায়ে একটি হাত রেখে চুপ ক'রে শুয়ে থাকলো সোমেন। ঝিরঝির হাওয়া দিচ্ছে গায়ে, কিন্তু পায়ের দিকটায় গরম। তাকিয়ে রোদ দেখলো বিছানায়। জানলা ভেজিয়ে দেবে? থাক। আড় হ'য়ে শুলো রোদের বাইরে পা রেখে; আবার চোখ বুজে তেপান্তরে চললো।

হোঁচট খেলো। 'এই, ওঠো!'

'কী?' মীরার জরুরি গলায় সোমেন চমকালো।

'এক ভদ্রলোক এসে ব'সে আছেন।'

ও, এই!

মীরা আবার ডাকলো, 'ওঠো !'

'এই সকালেই—!' বালিশে মুখ রেখে আবছা আওয়াজ করলো সোমেন।

'সকাল আর আছে নাকি ? ভাখো,' মীরা নিচু হ'য়ে স্বামীর কাঁধে টোকা দিলো। 'কোনো ফিল্ম কোম্পানির কেউ। এই-যে—'

আবার কার্ড! সোমেন কোণচোখে পড়লো : পি এন লাহিড়ী, আলফা ফিল্মস।

'ভদ্রলোক এসে ব'সে আছেন,' 'ব'সে' কথাটায় জোর দিলো মীরা।

সোমেন পুরো চোখ খুললো এতক্ষণে। উঠতে হ'লো স্বর্গসুখ থেকে, জাগতে হ'লো। মীরা এর মধ্যেই দুরন্ত, দিনের মুখোমুখি দাঁড়ানো। দিন-রাত্রির যে-কোনো সময়ে মীরা ফিটফাট, যথাযথ, পূর্ণমনস্ক, ঠিক সেই মুহূর্তের পাওনা নিয়ে তৈরি। কী ক'রে পারে ?

'তুমি যাও—আমি ও-ঘরেই চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

একজন অচেনার সঙ্গে সকালের প্রথম চা ? 'সেরে আসি না ?'

'না, না—এই সকালবেলায় এসেছেন ভদ্রলোক, এক পেয়ালা চা তো দিতে হয়।'

তবে তা-ই। সোমেন মুখ-চোখ ধুয়ে এসে গত রাত্রের ছাড়া পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়েই চ'লে যাচ্ছিলো, মীরা পিছন থেকে ডাকলো, 'চুলটা আঁচড়ে নাও।'

আচ্ছা।

মীরা তার কাছে এসে দাঁড়ালো। 'ফিল্মের জন্য বই চায় বোধহয়।'

'তা হবে।'

'শোনো, ক'বে দর হেঁকো কিন্তু,' মীরা ফিশফিশে গলায়

বললো, যদিও আগন্তুক দুই দেয়াল দূরে নিরাপদ। 'ওদের বোলচালে ভুলো না। আমি ব'লে না-দিলে কিছু তো পারো না তুমি।'

সোমেন মাথা নেড়ে দরজা পেরোলো। বসার ঘরে পা দিতেই একটি সহৃদয় কণ্ঠ তাকে নিজের ঘরে অভ্যর্থনা করলো, 'এই-যে—আসুন।'

সোমেন মুখোমুখি চেয়ারে বসলো। মস্ত মানুষটা; তাদের মাঝারি মাপের চেয়ারে যেন ধরছে না।

'আপনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। আমার নাম পরেশনাথ লাহিড়ী।'

দুটো কথার সম্বন্ধ জানার আশায় সোমেন তাকালো, কিন্তু এর পরেই ভদ্রলোক বললেন, 'আমি আপনার "জন্মান্তরে"র ফিল্মরাইট নিয়ে কথা বলতে এসেছি।'

সোমেন পকেটে হাত দিলো। যাঃ! ভুলে গেছে। সকালে চা যতক্ষণ না খায়, ভালো ক'রে জাগতেই পারে না, একটা সিগারেট হ'লে তবু—

'ফিল্মে বই দিতে আপত্তি নেই তো আপনার?'

আপত্তি? যেটা আজকাল সাহিত্যিকের একমাত্র আশা, উচ্চাশা, পরিণাম, শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ, তাতে আপত্তি! ইনি ঠাট্টা করছেন?

জবাবে দেরি দেখে আগন্তুক আবার বললেন, 'আপনি এ-সব ভালোবাসেন না আমি জানি। আর ফিল্মওলারাও আপনার নামে আঁৎকে ওঠে—ওরেব্ বাবা! এম-এ পাশ না-হ'লে কি সোমেন দত্তর বই বোঝা যায়!'

'কোন বিষয়ে এম-এ?' সোমেন একটু কৌতুকের লোভে পড়লো।

ভদ্রলোকের চোখের পাতা কয়েকবার মিটমিট করলো; চওড়া হেসে বললেন, 'আমি মশাই কোনো বিষয়েই কিছু পাশ-টাশ নই, আমি ব্যবসা করি। —তা ভালোই; —আপনার "জন্মান্তরে"র উপর কবে থেকে আমি চোখ দিয়ে রেখেছি—ভাগ্যিশ আর-কেউ আগেই নিয়ে নেয়নি!'

ভদ্রলোকের ভালোমানুষ-হাসিমুখের দিকে সোমেন চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকলো।

'তাহ'লে বলুন আপনি কত নেবেন।'

সোমেন দ্রুত চোখ নামালো। রবিবার সকালে ঘুম থেকে ওঠামাত্র হঠাৎ এই অচিন্ত্য প্রশ্নের মুখোমুখি!

'ভেবে-চিন্তে বলবেন মশাই, শেষটায় বলবেন না পরেশ লাহিড়ী আপনাকে ঠকিয়েছে!'

সোমেন ভাবার সময় নিলো: 'আপনি কি নতুন আরম্ভ করলেন?'

'নতুন? আমি এই পনেরো বছর ফিল্ম নিয়ে আছি। এর নাড়িনক্ষত্র আমার নখদর্পণে।'

'নাড়িনক্ষত্র নখদর্পণে'। বেশ বলেছে কথাটা, সুবিধেমতো কোথাও—

'এতদিন দাদার সঙ্গে ছিলাম—বাণীরূপার বীরেশ লাহিড়ী আমার দাদা। তা বীরেশ লাহিড়ী মস্ত চাঁই হ'তে পারেন, কিন্তু আমি-তো আর লক্ষ্মণভাই হ'য়ে জীবন কাটাতে পারি না। নিজেই আরম্ভ করলাম এবার।'

'আলকা-ফিল্মস তাহ'লে নতুন?' সোমেন খুশি হ'লো নিজের উপর, বেশ ব্যবসায়িক শোনালো কথাটা।

'হ্যাঁ, আলকা-ফিল্মস নতুন, আপনিও ফিল্মে নতুন। ভাববেন না

এ-কথা ব'লে দর কমাতে চাচ্ছি।' হাসির ঘোটা ভাঁজ পড়লো পরেশনাথের গালে। 'আপনার উচিত মূল্যই আপনি নেবেন।'

হাতের উল্টো পিঠে হাই চাপলো সোমেন। ওঃ, চা-টা এখনো —ঐ-যে, যাক। আগন্তুকের দিকে ফিরে বললো, 'আসুন চা-টা আগে—'

'চা? বেশ। সকালবেলা চা আমার ভালোই লাগে,' পরেশনাথ চেয়ারে একটু এলিয়ে বসলেন। আপনি কি এই উঠলেন ঘুম থেকে?'

'রোববার কিনা--' সোমেন একটু লজ্জা পেলো।

'হ্যাঃ! আমাদের আর রোববার-টোববার নেই, সেই কোন জন্মে স্কুল ছাড়ার সঙ্গেই খতম।' একটু থেমে, অন্য রকম সুরে পরেশনাথ বললেন, 'ময়না কেমন আছে?'

ময়না? ও, মীরা। 'ভালো আছে,' ব'লে সোমেন চায়ে চুমুক দিলো। আঃ!

'ময়না আর আমি একসঙ্গে খেলা করেছি ছেলেবেলায়।'

সোমেন বললো, 'ও।'

'ওকে বলবেন। আমার নাম শুনলে চিনবে। বকুলবাগানের জজদা।'

'জজ?'

'জজ। তখনকার রাজভক্ত মা-বাপ নাম রেখেছিলেন জর্জ।—তা ছেলেপুলে সব ভালো?'

'আমি ডেকে দিচ্ছি মীরাকে।'

'থাক, এখন আর ব্যস্ত ক'রে—'

'না, না, ব্যস্ত কিসের—' সোমেন ছুতো পেয়ে উঠে পড়লো। 'আমি-তো জানতাম না আপনি—একটু বসুন—আধ মিনিট।'

ঘরে এসে প্রথমে সিগারেট নিলো, তারপর মীরার দিকে ফিরে বললো, 'ভদ্রলোক তোমার চেনা।'

'আমার চেনা ? কে ?'

'তোমার জজুদা। বকুলবাগানের জজুদা।'

'জজু ?' মীরা ভুরু বাঁকিয়ে একটু ভাবলো। 'ও—ও, সেই জজু! সে-ই এখন পি এন লাহিড়ী হয়েছে! তা এসেছে কেন ? কী চায় ?'

'ঐ তুমি যা বলেছিলে।'

'বই তো ? তা টাকাপয়সার কথা কিছু—'

'এই হবে এবার। তুমি এসো।'

সোমেন ফিরে গিয়ে প্রথমেই সিগারেট এগিয়ে ধরলো অভ্যাগতর দিকে। পরেশনাথ সোজা একটি হাত তুলে বাধা দিলেন। 'না, আমারটা নিন।' প্রকাণ্ড পকেট থেকে টিন বের ক'রে সামনের টেবিলটায় রাখলেন। 'আসুন।'

টিনটার দিকে ঈর্ষার চোখে তাকালো সোমেন। খাশবিলেতি দামি জিনিশ। নিজের হাতের চ্যাপটানো ক্যাপস্টানের প্যাকেটটাকে ছোটোলোক দেখালো। স্নব!

সিগারেট ধরানো হ'লে পরেশনাথ বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হ'লো এই প্রথম, কিন্তু আপনার খবর আমি সবই রাখি, আপনার বিয়েতেও গিয়েছিলাম। অনেকে বলেছে যখন, সোমেন দত্ত যাকে বিয়ে করলো সে-মেয়ের কী ভাগ্য! আমরা বলেছি, সোমেন দত্তর ভাগ্যও কম না।'

সোমেন মীরাকে দেখলো ঘরে দাঁড়িয়ে। শেষ কথাটা শুনলো ? আবার শাড়িও বদলেছে এর মধ্যে। কেন, আগেরটা ভালো ছিলো না ? এটা আরো ভালো।

অতিথির চোখ পড়লো মীরার দিকে। চকিত হ'লেন না, উঠে দাঁড়ালেন না, শুধু একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কী ময়না, চিনতে পারো?'

মুচকি হাসলো মীরা। 'চিনতে পারার কি কথা?'

'বড্ড মোটা হয়েছি, না? তুমি কিন্তু সেই একরকমই আছো।'

'নাকি?' এই জীর্ণ কমপ্লিমেন্টের উত্তরে মীরাও বাঁধা বুলি ঝাড়লো, 'হঠাৎ আমাদের এত সৌভাগ্য যে আপনি—'

'আহা-হা "আপনি" আবার কেন? সেই তখনকার কথা—মনে নেই? বোসো, সব খবর-টবর বলো। ছেলেপুলে ক-টি।'

মীরা চেয়ারে বসতে-বসতে জবাব দিলো, 'দুই।'

'এতদিনে মোটে দুই?' সোমেনের দিকে চোখ ফেরালেন পরেশনাথ। 'ব্যাড। ভেরি ব্যাড।'

সোমেন মন দিয়ে আঙুলে ধরা সিগারেটের জ্বলন্ত মুখটা দেখতে লাগলো।

মীরা জিগেস করলো। 'আপ—তোমার?'

'ছেলেপুলে? ও আর বোলো না—এই একটা বিষয়ে আমি এম-এ পাশ।' পরেশনাথ একটি হাসি ছুঁড়লেন সোমেনের দিকে।

গালের পেশী হাসির মতো একটু খেলিয়ে সোমেন সিগারেট টানলো। আঃ—খাঁটি ভার্জিনিয়ার ধোঁয়া!

মীরা বললো, 'আশা করি তোমার মতোই দুরন্ত হয়েছে সব?'

পিছনে মাথা হেলিয়ে হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন পরেশনাথ। 'মনে আছে তাহ'লে? তা থাকবে না—একদিন একটা মাকড়শা ছেড়ে দিয়েছিলাম না তোমার গায়ে? কেমন লাগে সে-সব দিনের কথা ভাবতে!'

এর পরে 'ও কোথায়?' 'সে কেমন আছে?' 'তিনি কী হ'য়ে মারা গেলেন?' এই সব চললো খানিকক্ষণ, বুলবুল বাপ্টিকে একবার নতুন মামার কাছে হাজির করা হ'লো, জজদার অনারে আর-একবার চা হ'লো, আর মীরার উপরোধে তিনি চায়ের সঙ্গে প্রথমে একখানা তারপর আর-একখানা বিস্কুটও খেয়ে ফেললেন। প্রায় পারিবারিক পুনর্মিলন ঘটলো, সোমেন বাইরের লোক ব'নে গেলো। সে চা খেলো ব'সে-ব'সে, আড়চোখে কাগজ পড়লো, আর মাঝে-মাঝে নিরীক্ষণ করলো পরেশ লাহিড়ীকে। স্ফূর্ত, সক্রিয়, প্রশস্ত মুখ, আত্মবিশ্বাসী দাঁত, ফর্শা ঠোঁটের উপর পাৎলা-ছাঁটা গোঁফ কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে কখনো ঘন, কখনো ফাঁক-ফাঁক দেখাচ্ছে: কোনো মৃদু, লাবণ্যমাখা বাঘের মতো মুখ।

চা-বাসন সরানো হ'লো, ফাঁক পড়লো কথায়। চেয়ারে হেলান দিয়ে মীরা হালকা গলায় বললো, 'জজদা বুঝি আজকাল সিনেমা বানাও?'

'হ্যাঁ, সিনেমা বানাই!' জজদা এমন ক'রে হাসলেন যেন মীরার কথাটা জবর রসিকতা। 'তোমার স্বামীর "জন্মান্তর" বইখানা চাই যে ময়না।'

উনি কিন্তু সিশি ছবির ঘোর অভক্ত,' ব'লে মীরা ঠোঁটের কোণে হাসলো।

'আহা-হা ওঁকে কেন ভক্ত হ'তে হবে! উনি লিখে দেবেন, আমি ছবি বানাবো, আর দেখবে, বিড়িওলা থেকে গাড়িওলা অব্দি সবাই। আর টাকাটাও তো চাই জীবনে।' পরেশনাথ একপলক তাকালেন বইয়ের আলমারিটার দিকে, যেখানে কাচের বদলে পীসবোর্ড বসানো। কত পরিশ্রম মীরার—সোমেন চকিতে ভাবলো—কিন্তু শত পরিশ্রমের ফল শুধু এইটুকু, শুধু ভদ্র দারিদ্র্য, টাকে-টুয়ে জাত বাঁচিয়ে চলা।

খোলাখুলি গর্বিব হ'তে দোষ কী? না, সেটা কুরুচি। মালতী সেন ওরই মধ্যে—

'তাহ'লে বলুন আপনি কত নেবেন?' পরেশনাথের চোখ সোমেনের দিকে ফিরলো।

সোমেন দেখলো মীরা নিস্পৃহ চোখে অন্য দিকে তাকিয়ে। কত বলবে? কত বলা উচিত? এ-সবের ঠিক খবর সে রাখে না, শুধু হাজার-লাখের গুজব শোনে চারদিকে! হঠাৎ একবার তার লোভ হ'লো অসম্ভব কিছু ব'লে ভাগিয়ে দিতে।—পাগল।

মীরার গলায় রেশমি আওয়াজ বেরোলো, 'এ আর উনি কী বলবেন—তোমাদের যেটা ম্যাক্সিমাম সেটাই দেবে।'

বাঃ! শাবাশ বলেছে।

'আমরা ম্যাক্সিমাম-মিনিমামের ধার ধারি না, ঝোপ বুঝে কোপ চালাই,' দরাজ গলায় জবাব দিলেন পরেশ লাহিড়ী।

'তা এক কোপে গলা কেটো না তাই ব'লে।'

পরেশনাথের সজোর হাসিতে সোমেন চমকালো। খুব হাসেন ভদ্রলোক, হজমের গোলমাল নেই, উচিত অনুচিতের টানাটানিতে স্নায়ুর সুতো ছেঁড়েনি।

'"এক কোপে গলা কেটো না"—বেশ বলেছো কথাটা!' যেন চেষ্টা ক'রে হাসি থামিয়ে পরেশনাথ বললেন, 'তবে আমি বলি কী—এটা একটু কমসমেই ছাড়ো। তারপর ছাখো না—একবার নাম ফাটুক সিনেমায়—টাকার বিছানায় গড়াবে তখন!' এমনভাবে বললেন যেন মীরারই বই, মীরারই টাকা।

মীরা কথা বললো না, তার ঠাণ্ডা চোখের চকচকে কোণ স্বামীকে ছুঁয়ে গেলো। সোমেন বুঝলো সে কিছু না-বললে আর ভালো

দেখায় না। অগত্যা মোলায়েম হেসে বললো, 'আপনি তো উচিত মূল্যই দেবেন—তার উপর আর কথা কী।'

'এই-রে! আমাব উপরেই ছেড়ে দিলেন! দর-কষাকষি ক'রে যা বা কিছু কমাতে পারতাম, তা আর হ'লো না!' পরেশনাথ হতাশ-ভাবে হাত ওল্টালেন; সোমেনের মজা লাগলো। 'তাহ'লে বলি শুনুন—সাফ কথা—হিন্দি-বাংলা ডবল ভার্শনের জন্য চার হাজার। রাজি?'

মীরা আলগোছে বললো, 'তবে-যে শুনি আট দশ হাজার নাকি পাওয়া যায়?'

পরেশনাথ সমস্ত মুখ ভ'রে নিঃশব্দে হাসলেন, কিন্তু হাসির মানে এবারে ঠিক বোঝা গেলো না। 'কোনো-একদিন সোমেন দত্ত হয়তো আরো বেশি পাবেন।'

ছোট্ট হাসি ফুটিয়ে মীরা বললো, 'তাহ'লে এখনই কিছু বেশি হ'লে দোষ কী?' কথার শেষে ঈষৎ ফিরলো স্বামীর দিকে, ঠোঁটের হাসি মুছে গেলো।

সোমেন চট ক'রে বললো, 'ডায়লগও লিখতে হবে তো?'

'তা তো হবেই!'

'সেটা তাহ'লে আলাদা?' আস্তে পেশ করলো মীরা।

পরেশনাথের চোখ থেকে দৃষ্টির একটা তীর ছুটলো মীরার দিকে। মনে হয়েছিলো সঙ্গে-সঙ্গেই জবাব দেবেন কথার, কিন্তু একটু চুপ ক'রে থেকে সিগারেটে টান দিলেন তিনি; বিষণ্ণ, চিন্তাশীল বাঘের মতো তাঁকে দেখালো। হঠাৎ ধোঁয়ার সঙ্গে নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আচ্ছা! সবসুদ্ধ পাঁচ। ঠিক আছে?'

সোমেনের অদ্ভুত লাগলো, যেন বিশ্বাস হ'লো না। পাঁচ হাজার! কোনো একখানা বই লিখে পাঁচশো টাকা পায়নি কখনো।

'আচ্ছা। তা-ই,' পরেশনাথের ভঙ্গি আবার সহজ হ'লো। 'আমারও রোখ পড়েছে বইটার উপর, আর ময়নারও বাড়িঘরদোর সব চাই তো এখন আস্তে-আস্তে। ভালো।'

অন্য দু-জন কথা বললো না, নড়লো না। সোমেন হঠাৎ ভাবলো : মীরা আর আমি সহযোগী এখন, ষড়যন্ত্রী। স্বামী-স্ত্রীকে মিলিত করেছে টাকা, বাস্তব, জীবনের মূর্ত তথ্য।

'আমি তাহ'লে কাল আসবো কনট্র্যাক্ট করতে। থাকবেন তো সন্ধেবেলা?'

কাল? সোমবার। মালতী সেনের ওখানে। সোমেন বললো, 'একটু দেরিতে কিন্তু।'

'কেন?' প্রশ্ন করলো মীরা।

'সোমবার তো দেরি হয় আপিশে।'

'কাল একটু সকাল-সকাল পাবো না? তাহ'লে জজদাকে একটু চা খেতে বলি আমাদের সঙ্গে।'

'না ময়না, এখন ও-সব থাক—চা তো খেলাম এইমাত্র। বড্ড ব্যস্ত আছি ক-টা দিন, শিগগিরই আবার বম্বেতে উড়তে হবে, পরে হবে। কাল সাতটা? সাড়ে-সাতটা?'

সোমেন বললো, 'ঠিক আছে।' একটু পরে জিগেস করলো, 'কিছু অ্যাডভান্স দেবেন কি?'

'নিশ্চয়ই! অর্ধেক কালই পাবেন, বাকিটা আপনার লেখা শেষ হ'লেই।'

হঠাৎ দুরদুর ক'রে উঠলো সোমেনের বুকের মধ্যে।

'লেখাটা তাড়াতাড়ি চাই কিন্তু।'

'বই তো লেখাই আছে, শুধু—'

'হ্যাঁ, কাজ আপনার বেশি না—তবে একটু বদল-টদল আছে তো।'

'বদল ?'

'বেশি কিছু না, এই দু-এক জায়গায় একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে দেবেন আরকি।'

ঝেড়ে-ঝুড়ে ? অদ্ভুত ভাষা।

'আপনার বইয়ের নায়ক আত্মহত্যা ক'রে মরলো, কিন্তু আমাদের দেশের অডিয়েন্স তো জানেন—ট্র্যাজেডি তারা কিছুতেই নেবে না। শেষটায় ঐ একটা মিলন-ফিলনই কিছু ঘটিয়ে দিন।'

পরেশনাথের সদ্য-কামানো চকচকে চোয়ালের দিকে সোমেন চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকলো।

'আর-এক কথা। আপনার মায়ার কুমারী হওয়া চাই।'

সোমেন হাত বাড়িয়ে পরেশনাথের টিন থেকেই একটা সিগারেট নিলো।

'কুমারী ?'

'আপনি আছেন কোথায় ? পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম কি চলতে পারে ?'

'পারে না বুঝি ?'

'ফিল্মে ? উহুঁ।' সোমেনের কোণঠোঁট হাসি ব্যাপ্ত হ'য়ে ছড়ালো পরেশনাথের মুখে। মাথা নেড়ে বললেন, 'আইন হ'য়ে গেছে।'

'আইন ?' সোমেনের চোখ বড়ো হ'লো, শুধু কৌতুকে না, প্রকৃতই বিস্ময়ে।

'জানেন না ? আমরা যে বড্ড সচ্চরিত্র আজকাল। ফিল্মে কারো মদ খাওয়াও বারণ।'

'মানে—ফিল্মে যারা কাজ-টাজ করে, তাদেরও ?'

'তা তো ঠিক জানি না,' পরেশনাথের মুখ গম্ভীর হ'লো, কিন্তু

চোখে হাসির চকচকানি লেগে থাকলো। 'তবে ফিল্মে ও-সব দেখাতে নেই।'

'ও। কেউ দেখে ফেললেই দোষ। যাক—যা ভাবনা হয়েছিলো আমার!'

স্বামীর দিকে বাঁকা তাকিয়ে মীরা বললো, 'এমন ক'রে বলো যেন তুমি ও-সব কতই খাও-টাও।'

'এই আরকি কথা,' মীরার কথাটা টপকে পার হলেন পরেশনাথ। 'এ-দুটো ক'রে দিন আমাকে—ব্যাপার তো কিছু না—ও-সব বাঁচা, মরা, বিয়ে সব আপনার হাতেই তো! একটা চমৎকার লাভ স্টোরি চাই আপনার কাছে—বুঝেছেন না?'

বুঝেছে। একটা চমৎকার লাআভ-স্টোরি। এমন ক'রে বললো যেন 'ভাব'-এর সঙ্গে মেলে।

'বই দেখতে গিয়ে বক্তৃতা শুনে-শুনে এখন ঢেঁকুর উঠছে লোকের। ঠিক এক্ষুনি আপনার বইটা বেরোলে—তা এক মাসের মধ্যে পুরোটা চাই কিন্তু। হবে তো?'

মেঝের গায়ে সরু একটি ফাটা দাগের উপর সোমেনের চোখ নিবিষ্ট হ'লো। বই। মানে, ফিল্ম। নামে ভুল কোরো না, নামের ভুলেই কাজের ভুল। বাংলাদেশে ফিল্মকে বলে বই, আর সেই 'বই'য়েরও বই ছাপা হয়!' এমন দেশটি কোথাও খুঁজে।

মীরা আর অপেক্ষা না-ক'রে বললো, 'হবে না কেন? উনি বসলেই লিখতে পারেন।'

সোমেন চোখ তুলে মীরা আর পরেশনাথের মাঝামাঝি তাকালো। হেসে বললো, 'না, পারি না। আমি লিখতেই পারি না আজকাল।'

সোমেনের মুখের উপর সহৃদয় চোখ রাখলেন পরেশনাথ। বদলাতে খারাপ লাগছে—এই তো? কিন্তু উপায় কী, বলুন। এ তো আর আমাদের হাতে নেই।'

'সত্যি!' মীরা টুক ক'রে বললো, 'এর উপর আর কথা কী।'

'কিচ্ছু না!' পরেশনাথ আঙুল ছড়িয়ে হাত ঘোরালেন। 'বই যেমন লেখা আছে তাতে লালবাজারেই আটকাবে।'

'একেবারে হাজতে পুরবে?' সোমেনের ঠোঁটে হাসি ফুটলো।

পরেশনাথ মুখ ভ'রে নিঃশব্দে হেসে নিয়ে তারপর গম্ভীর মুখে বললেন, 'আগে লালবাজার, শেষে সেন্সর। আমরা দুই তোপের মাঝখানে।'

'মানে?'

'ও, আপনি জানেন না? ফিল্মের গল্প আগেই লালবাজারে পাশ করিয়ে নিতে হয় যে আজকাল।'

'কেন?'

'কেন আবার! এ-ই হচ্ছে স্বাধীন দেশের আইন!' পরেশনাথ শেষ কথাটা ঝাঁকালো সুরে বললেন।

সোমেন এতক্ষণে পুরো কথাটা বুঝলো। মুহূর্তের জন্য পরম অসহায় লাগলো, যেমন লাগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, যখন পর-পর ট্রাম-বাস হেসে-হেসে চ'লে যায়, কিন্তু সে একটাতেও উঠতে পারে না। যাক, সব হ'ক, সে দাঁড়িয়েই থাকবে।

'তাহ'লে দেখছেন তো, বই আপনাকে বদলাতেই হবে।'

সোমেন মাথা নিচু ক'রে এক গোছা চুল আঙুলে জড়ালো। একটুক্ষণ তিনজনেই চুপ।

মীরা ছোট্ট কেশে বিনীত স্বরে বললো, 'আমার কিন্তু মনে হয় কালকে আরো ভালোই হবে।'

'হবে না?' পরেশনাথ সোৎসাহে মীরার দিকে তাকালেন।

'তাছাড়া খানিকটা বদলে-টদলে না-নিলে কি আর ফিল্ম হয়!' ব'লে মীরা স্বামীর দিকে তাকালো।

সোমেন চুল-জড়ানো আঙুলটি আস্তে ঘোরাতে লাগলো। আরো একটু দেরি ক'রে পরেশনাথ বললেন, 'আর আপনার বই-তো রইলোই—ফিল্মটা কে মনে রাখতে যাচ্ছে বলুন—শনিবার দেখবে, রোববার বলবে, সোমবার ভুলবে।'

সোমেন চুলের গোছা ছেড়ে দিলো, কুঁকড়ে সেটা তার কপালে পড়লো।

হালকা ছায়া নামলো পরেশনাথের মুখে। 'না-হয় ভেবে দেখুন দু-একদিন; আমি পরেও আসতে পারি।'

আবার একটুক্ষণ চুপচাপ। একবার স্বামীর দিকে, একবার অতিথির দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার ঠাণ্ডা গলায় মীরা বললো, 'অজদার যখন তাড়া আছে, তখন কালই তো ভালো।'

সোমেন অস্ফুটে বললো, 'আচ্ছা।' পরেশনাথের মুখের দিকে চোখ তুলে আবার বললো, 'আচ্ছা।' নিশ্বাস ফেলে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।

৭

সোমবার আপিশে গিয়ে সোমেন প্রথমেই বস্-এর ঘরে ঢুকলো। বস্ তারই বয়সী, কিন্তু দেখায় বছর দশেকের বড়ো। মাথার চুল পাৎলা, গালভাঙা মুখ গুরুগম্ভীর। কিন্তু সোমেনকে খাতির করেন, ফাঁক পেলে গল্পও করেন এক-আধটু। তা মাইনে দিয়ে সাহিত্যিক পুষছেন, এটুকু সুবিধে কি আর না নেবেন।

তেজিমন্দির ফিরিস্তি থেকে চোখ নামিয়ে হরিদাস গাঙ্গুলি বললেন, 'বসুন।'

সোমেন কথা পাড়তে এক সেকেণ্ড দেরি করলো না। 'আমার কিছু টাকা চাই।'

'সেটা তো আমরা সকলেই চাই, সোমেনবাবু।' গাঙ্গুলি একটু কৌতুকের ফুরশৎ দিলেন নিজেকে, সামনের দুটো রুগ্ন দাঁত দেখা গেলো।

'এ-মাসের মাইনে থেকে দু-শো টাকা অ্যাডভান্স চাই আমি।'

'অ্যাডভান্স?'

'আজই চাই।'

'আজই?'

'হ্যাঁ, আজই চাই।'

এক পলক চুপ ক'রে থাকলেন গাঙ্গুলি। 'একদিনেই মাইনে উড়ে গেলো?'

সোমেন জবাব দিলো, 'আমার দরকার।'

'দু-শো টাকা?' গাঙ্গুলির কাচের মতো চোখ থেকে হঠাৎ একটা ঝিলিক বিঁধলো সোমেনকে। সোমেন কুঁকড়ে যেতে-যেতে সোজা হ'লো : মনে পড়লো পাঁচ হাজার। স্পষ্ট বললো, 'হ্যাঁ, দু-শো।' ভাবলো, ডানদিকে তিনটে শূন্যওলা একটা সংখ্যা নাও, শেষে বসাও টাকা, তারপর বলো পাচ্ছি। আর সংখ্যা থাকলো না, হ'লো ম্যাজিক। কেমন ম্যাজিক?

গাঙ্গুলি সোমেনের দিকে সিগারেটের টিন এগিয়ে দিলেন, কিন্তু নিজে নিলেন না। 'বাড়িতে অসুখ?'

'না, অসুখ না।'

'কোনো বিপদ-আপদ?'

'না।' সোমেন বুঝলো তার মনের জোর কমছে। থাক না। লাহিড়ী তো আছেই। কিন্তু চেক নিশ্চয়ই? আর চেক ভাঙাতে—

'রেস-এ যান-টান?'

সোমেনের কানের ডগা লাল হ'লো। তা সাহিত্যিকদের বদনাম তো আছেই। আর শনিবারে মাস-মাইনে পেয়ে সোমবারেই ফের আগাম চাইলে—

'আপনি তো জানেন আপিশে অ্যাডভান্স দেবার নিয়ম আর নেই।'

থাক। কিন্তু মালতী সেন? দু-দিনে আর কী হবে। দু-দিন? মস্ত অচেনা শহরে একটা পয়সা হাতে না-থাকলে দুটো দিন যে অনেক দিন। ভাবনা কী, আমি আছি। আর এই তো পরেশ লাহিড়ী—

'তাহ'লে আপনি আমাকে দু-শো টাকা ধার দিন।' সোমেন অবাক হ'য়ে গেলো নিজের কথা নিজের কানে শুনে।

'সিগারেটটা ধরান,' গাঙ্গুলি দু-হাতের কোটরে দেশলাই জেলে

সোমেনের কাছে ধরলেন। অনিচ্ছায় সিগারেট ধরিয়ে সোমেন মুখের দিকে তাকালো।

'লেখার বাজার খারাপ?'

'খুব।' সোমেন ঠোঁটের কোণে হাসলো।

'তা লেখকরা তো অনেকেই দেখি ফিল্মে ভিড়েছেন। ওতে পয়সা আছে।'

সোমেনের হাসি পেলো, সামলে নিয়ে গম্ভীর হ'লো। হ্যাঁ, আছে বইকি। দেখছেন না দেশের গাইয়ে আঁকিয়ে লিখিয়েদের ভিড়। যে-মেয়ে গান গায়, যে-মেয়ে খাপসুরৎ, যে-ছেলে পরশু আর্টস্কুলে ভরতি হ'লো, যে-ছোকরা প'ড়ে ম'রে মাসিকপত্রে দুটো গল্প ছাপিয়েছে, সকলেরই লক্ষ্য তো ঐ, চেষ্টা তো ঐ। ভালো, ফিল্মের ভালো হোক, কিন্তু আর-কিছু কি দেশে থাকবে না? ফরমাশ ছাড়া, মাপজোকের বাইরে, জোগান-চাহিদার চিন্তা ছাড়িয়ে, শুধু কিছু বলার আছে ব'লেই কেউ আর আঁকবে না, গাইবে না, লিখবে না?

'আপনি কোনো বই দেননি?'

'ফিল্মে?' সোমেন একবার সিগারেট ফুঁকলো। 'না।' উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আচ্ছা।'

মাথাটি একটু কাৎ ক'রে গাঙ্গুলি তার দিকে তাকালেন। 'আমি একবার ফিল্মে হাত দেবো ভাবছি। আপনি কী বলেন?'

'বেশ তো।'

'নাচ গান ফুর্তির একটা জমাট বই আমাকে লিখে দিতে পারেন?'

'নিশ্চয়ই পারি।' সোমেন অমায়িক হাসলো। 'আপনি যে-রকম বলবেন ঠিক সে-রকমই লিখতে পারি।' একটু থেমে আবার বললো, 'ও কিছু না, আপনি নিজেই লিখে নিতে পারেন ইচ্ছে করলে।'

গাঙ্গুলি এ-কথায় কৌতুক বোধ করলেন, হলদে দাঁত দুটোর সঙ্গে ঠোঁটের কালচে উল্টো দিকটাও দেখা গেলো। সোমেন আবার বললো, 'আচ্ছা।'

'একটু দাঁড়ান।' গাঙ্গুলি পেনসিলে একটা চিরকুট লিখলেন, 'এটা কেশিয়ারকে দিলেই—'

'অনেক ধন্যবাদ।'

'অ্যাজ এ স্পেশল কনসেশন আপনাকে দিচ্ছি এবার। কিন্তু আর যেন এ-রকম না হয়। আপিশে একজনকে ফেভার করলে অন্যেরা—'

'থ্যাঙ্কিউ ফর দি ফেভার।' সোমেন চ'লে যাচ্ছিলো, গাঙ্গুলি ডাকলেন, 'শুনুন।'

সোমেন ঘুরে দাঁড়ালো।

'আজ ছুটির পর আসুন না আমার ঘরে, আমার আইডিয়াটা শুনবেন। ফিল্মের কথা বলছি।'

'আজ?'

'অসুবিধে হবে?'

'আজ ঠিক—'

'এখানে চা খাবেন, তারপর আমার গাড়িতেই ফিরবেন?'

সোমেন দ্রুত ভাবলো। মালতী সেন, বাড়িতে আবার পরেশ লাহিড়ী। এদিকে বস্‌, তাঁর স্পেশল কনসেশন এইমাত্র। কিন্তু একদম হাতে-হাতে নগদ দাম নেবে?

'আজ আপনার সুবিধে হবে না মনে হচ্ছে?'

সেই কাচের মতো ভাবটা গাঙ্গুলির চোখে দেখতে পেলো সোমেন। লম্বা নিশ্বাস নিয়ে বললো, 'আজ আমার জরুরি একটা কাজ

আছে। কথা দিয়েছি একজনকে—মানে, কাল আপনার সময় হয় না?'

গাঙ্গুলি স্থির চোখে একটু তাকিয়ে থাকলেন, অস্ফুট একটা 'আচ্ছা' ব'লে সামনের কাগজে চোখ নামালেন।

সোমেন বেরিয়ে সোজা দোতলায় কেশিয়ারের টেবিলে। চিরকুটটার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে কেশিয়ার বললেন, 'বসুন।'

'ঠিক আছে।' সোমেন সবিনয়ে দাঁড়িয়েই থাকলো।

'বসুন!' কেশিয়ার গলা চড়ালেন।

সোমেন আর অবাধ্য হ'লো না। কেশিয়ার বুড়ো মানুষ, জাঁদরেল বুড়ো। টকটকে ফর্শা, লালচে গাল, আরো লাল নাকের ডগাটি। মাঝে শাদা ধারে হলদে আভা মুখুয্যে গোঁফ। চেহারা দেখলে ভক্তি হয়।

চিরকুটটা হাতে নিয়ে কেশিয়ার প্রায় এক মিনিট ধ'রে উল্টে-পাল্টে দেখলেন, তারপর সোমেনের দিকে চোখ তুললেন।

'The Board of Directors is of opinion that the Company's expenditure on Publicity can be reduced without any detrimental effects on the Company's interests.'

ইংরেজি বেরোলো জাঁকালো। বিপিন পালের ভক্ত, নিজেও কংগ্রেসি বক্তা ছিলেন, শখ মেটেনি এখনো। নিরীহমতো কাউকে পেলেই—

'What does the Publicity Officer say to this?'

সোমেন মধুর ক'রে হাসলো।

'The Publicity Officer's friends will suffer.'

এ-কথা শুনে সোমেন অবাক হ'লো। 'কেন?'

কেশিয়ার ইংরেজির বাগ্মিতায় শিখর ছেড়ে চলতি বাংলার সমতলে

নামলেন। 'খাতিরের বিজ্ঞাপন বন্ধ।' ফুর্তিসে এক চোখ টিপে আরো সোজা ক'রে বললেন, 'ভিনাস কোম্পানিতে নাকি বিজ্ঞাপন আর পাব্লিসিটি অফিসারের লেখা এক খামেই পাঠায়!'

সোমেনের মুখ ঝুললো। কিন্তু তখনই বললো, 'আপনি তো খুব খবর রাখেন দেখছি।' ব'লে চোখে চোখ আটকালো, মনে-মনে বললো কিছুতেই না, আমি কিছুতেই না, ও-লোকটা চোখ নামাবে। ক্যেশিয়ারের চোখের ফুর্তি আরো ঝিলকোলো, সোমেন চোখের ভাব স্থির রাখলো। মনে আনলো গাঙ্গুলির কাচের মতো চোখ, প্রাণপণ নকল করলো। ফুর্তি নিবলো, গম্ভীর হ'লো, চোখ নামলো টেবিলে। চিরকুটে নীল পেনসিলের চ্যাঁড়া মেরে কেশিয়ার প্রত্যর্পণ করলেন। 'কাউন্টার।' গলা একটু নিস্তেজ।

জিতেছে! সব কটা যুদ্ধে জিতেছে! সোমেন লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামলো একতলায়। কাউন্টারে কেরানি রসিদে সই নিয়ে জিগেস করলো, 'বড়ো নোট দেবো?'

'ছোটো।'

কেরানি দশটাকা পাঁচটাকা মিশিয়ে বাণ্ডিল বানালো, দু-বার গুনে হাতে দিলো। সোমেন আর তাকালো না, বাণ্ডিল বুকপকেটে পুরে—

'স্ট্যাম্পের চার পয়সা!'

ওঃ!

আনি দিয়েই তেতলায় নিজের কামরায়, চেয়ারে ব'সে তারপর বুঝলো হাঁপাচ্ছে। লিফট নেই ওঅটর্লু স্ট্রীটে গলির মধ্যে পুরোনো বসতবাড়িতে আপিশ। যাকগে, আপিশ নিয়ে আর নালিশ না, এক্ষুনি দু-শো টাকা আর পেতো কোথায়? সোমেন কাজে খুঁকলো।

দু-দিনের ডাক সাঁৎরে কূল যখন ছোঁয়-ছোঁয়, সামনে এসে দাঁড়ালো নিরঞ্জন, পাব্লিসিটির কেরানি।

সোমেন এক পলক তাকিয়ে বললো, 'তুমি ছেলেমানুষ, অত পান খাও কেন?'

'আমার বাবাও খুব পান খান স্যর,' নিরঞ্জন একগাল হাসলো। উস্‌প্‌ ক'রে পানের রস টেনে নিয়ে বললো, 'আপনাকে একটা সুখবর দিতে এলাম। আমি "ধন্বন্তরি"র ফিল্ম-ক্রিটিক হয়েছি।'

'"ধন্বন্তরি"?'

'বাঃ! নতুন ডেইলি "ধন্বন্তরি"। আমাদের "শীত আগত ঐ" গেলো সেদিন। আপনার কপির খুব সুখ্যাতি শুনলাম সেখানে। বাংলা বিজ্ঞাপন নিয়ে আর্টিকেল লিখছে ওরা, তাতে আপনার কথা—'

'কত মাইনে?'

'আমার? মাইনে না, আর্টিকেল পিছু আট টাকা, তার উপর ট্রেডশোতে সব ফিল্ম দেখবো!' হাসিতে নিরঞ্জনের লাল-লাল দাঁত প্রায় সব ক-টা বেরিয়ে পড়লো।

চট ক'রে চোখ নামালো সোমেন। আর-একটা চিঠি খুললো।

নিরঞ্জন টেবিলের গায়ে লেগে থাকলো।

'আর কিছু বলবে?'

'আপনি একটা লেখা দেবেন, স্যর, "ধন্বন্তরি"তে?'

সোমেন দরকারি চিঠি ক-টা বেছে নিলো।

'ওদের রোববারে? নতুন কাগজ—এখনো তেমন দিতে-টিতে অবশ্য—'

সোমেন চোখ তুলে বললো, 'আমি আজকাল কিছু লিখি না।'

নিরঞ্জন একগাল হাসলো এর জবাবে। 'অন্তত কবিতা-টবিতা?'

সোমেনের চোখের পাতা পড়লো। অন্তত কবিতা-টবিতা! কত লোকের মুখে শুনলো। বেদম শস্তা মাল।

বেয়ারা টেবিলে চিরকুট রেখে চ'লে গেলো।

'গাঙ্গুলিমশাইর সই দেখছি,' নিরঞ্জন ঘাড় বাড়ালো। 'ব্যাপার কী?'

'সামনের বছরের প্রোগ্রাম আজ চারটের মধ্যে চাই।'

'আজ চারটের মধ্যে! গাঙ্গুলিমশাই পাগল হলেন?'

সোমেন নিশ্চিন্ত হ'লো। গাঙ্গুলিকে রাগিয়েছে তখন, গাঙ্গুলি শোধ নিলেন। পাঁচদিনের কাজ পাঁচ ঘণ্টায় কেউ করতে পারে না, করতে-যে বলা হ'লো সেটাই জব্দ। ব্যস, হিশাব সাফ!

নিরঞ্জন হাসিখুশি বললো, 'পাগল কেন হবেন। খশড়া হ'য়ে যাবে।'

'ও, খশড়া! তা আর মুশকিল কী। ডেইলি সব ক-টা রেখে ম্যাগাজিন থেকে বাদ দিলেই হবে। বাজেট তো কম এবার। আমি ক'রে দেবো?'

'তুমি এক কাজ করো। আমাকে কপির ফাইলটা পাঠিয়ে দাও এখনই।' নিরঞ্জনকে বিদায় দিয়ে সোমেন চিঠিপত্র ঠেলে রাখলো।

বের করলো মিডিয়া-লিস্ট। নিরঞ্জন ঠিক বলেছে; ডেইলি সব ক-টা, বেশি কাটতির মাসিক ক-টাও রাখা চাই। কম-কাটতির ম্যাগাজিন কাটো। সব ক-টা? না, কোনো পার্টি-অর্গ্যান বাদ না পড়ে। ফিল্ম, স্পোর্টস, ফিনান্স, মেডিকেল, উইমেন্স জর্নাল, এ-সব থেকেও বেছে-বেছে···বাকি থাকলো চারটি কি পাঁচটি সাহিত্যের জোগানদার। কাটতি কম, চালায় লেখকরাই, কেউ-কেউ তার বন্ধু। 'The Publicity Officer's friends will suffer.' সোমেন

সব কন্টাক্টেই লাল পেনসিলের ক্রস বসালো। কিন্তু কন্টাই বা টাকা বাঁচালো কোম্পানির। ত্রুর্দিন, সাহিত্য ম'রে আসছে। না, সাহিত্য মরে না।

এর পর অন্য কাগজের মান কাটা সহজ। সোমেন অনেকগুলি উপড়ে দিলো। কিন্তু সবশুদ্ধ যতটা কমলো, টাকা তুলনায় আরো কম। অতএব ইনসারশন কমাও, স্পেস কমাও। জটিল পাটিগণিত। অনেক কাগজ, অনেক কাটাকুটি, অনেকবার নিরঞ্জন। ছোকরা পান খায় বিশ্রী, কিন্তু অঙ্কের মাথা সাফ।

চারটের আগেই পাঠিয়ে দিলো।

আজ আর অন্য কাজ হবে না, কিন্তু আর-একটা ঘণ্টা ব'সে থাকতে হবে। থাকি। সোমেন চা আনিয়ে হেলান দিয়ে বসলো। বেশ লাগছে, যেন অনেকদিন পর বেশ লাগছে।

'আপকা টেলিফোন।'

যেতে হ'লো ম্যানেজারের ঘরে।

'সোমেন দত্ত বলছি।'

'আমি দেবীদাস। শোনো: "বিশ্বরূপে"র কলাম আমি ছেড়ে দিচ্ছি—'

'ছেড়ে দিচ্ছো? যাক, বাঁচলে।'

'ওদের স্টাফেই ঢুকলাম—'

'ও। তা—বেশ। ভালো!'

'হ্যাঁ, মন্দ না। তা শোনো, তুমি ঐ কলামটা নেবে?'

'আমি!'

'বেট ভালো। পেমেন্ট পাংচুয়াল। বলো তো নেক্সট উইক থেকেই—'

'আমি ও-সবের কিছু বুঝি না।'

'বোঝো না কী আবার?'

'ইজ্ম আর ইজমকে বড়ো ডরাই।'

'কী বললে? ইজ্ম আর ইজম!' ওপার হাসলো। 'হ্যাঃ! বুঝতে গেলেই হয়েছে! শোনো: আমি ব'লে দিচ্ছি। তোমার আপিশে তো সব ক-টা কাগজই আসে—মাঝে-মাঝে চোখ বুলোবে—আর ঐ সাত-পাঁচ মিশিয়ে একটু মজা ক'রে সাজিয়ে দেবে আরকি। রোববারের আধ ঘণ্টার কাজ তোমার। ও কিছু না।'

সোমেন একটু ভাবলো। নেবে? পারবে? কেন পারবে না, সবাই সব পারে। ' কিন্তু সব ক-টা কাগজ পড়া!

'কী? বলো!'

মনে পড়লো পরেশ লাহিড়ী। পাঁচ হাজার। ক-দিন? তা আপাতত—তাছাড়া সময় কই? এ-মাসের মধ্যেই চাই তো লাহিড়ীর।

'মাসখানেক পরে হয় না?'

'পরে? তা...'

আচ্ছা একটু ভেবে দেখি। কেমন?'

'বেশ। কাল জানাবে?'

'কাল?'

'দুটো থেকে আটটা আপিশে আছি। গিভ মি এ রিং। এঁদের তাড়া আছে। আর তোমাকে পেলে এঁরা—কিন্তু এ-সব বোঝো তো—'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! তা এমনিতে আছো কেমন? কিছু লিখছো?'

"বিশ্বরূপে" রোজ লিখছি। তুমি?'

'রোজ বিজ্ঞাপন লিখছি।'

হাসির কলিশন হ'লো তারে।

'আচ্ছা তাহ'লে—'

'আচ্ছা।'

ফিরে এসে চা মুখে তুললো: ঠাণ্ডা। লম্বা ঢোঁকে তাই খানিকটা খেয়ে নিয়ে মস্ত মোটা লাল ফাইল খুলে বসলো। হঠাৎ মনে পড়লো দেবীদাসের সঙ্গে তার তর্ক, গল্প, কল্পনা। দু-পয়সার চায়ের পেয়ালায়, আমহার্স্ট স্ট্রীটের ফুটপাতে, পার্কের ঘাসে এপ্রিলের এগারোটা রাত্রে। গর্কী, হার্ডি, হামসুন, আনাতোল ফ্রাঁস···তখনকার দিগ্বিজয়ী সব। হুইটম্যানের মন্ত্র। সে কবেকার কথা? এই তো সেদিন—দেবীদাস জোর গল্প লিখছে তখন, আর সে গল্পের দিকে সকরুণ অবজ্ঞায়—

অতীত! মিথ্যা আক্ষেপ। বাস্তবে বাঁচো, বর্তমানকে মানো। খবরকাগজ, বিজ্ঞাপন, সিনেমা—এরাই বর্তমানের বাস্তব। এদের নিয়ে তুমিও বেঁচে আছো। 'সত্য কেবল পশুর মতো বাঁচা।' আর আমি যা চেয়েছিলাম, আমি যা চাই, আজও চাই, সবচেয়ে বেশি যা চাই? তাও থাকলো। পৃথিবীর সবচেয়ে সবুজ যে-শ্যাওলা, সে-তো পাথরেই জন্মায়।

সোমেন লাল ফাইলের পাতা উল্টিয়ে গেলো। কত বিজ্ঞাপন লিখেছে এ-ক'য় বছরে! চারশো পাঁচশো হবে। অগ্নিবাণে পরিত্রাণ, নিশীথের তিমির কেশে, পুষ্পসম গন্ধ, শীতের শত্রুতা, রূপের শাশ্বত, উজ্জয়িনী, পদ্মিনী যদি আজ বেঁচে থাকতেন, নূর জাহান, আপনার হাত দুটি, একটি মেয়ের কাহিনী, বন্দনা দেবীর স্বামী, ক্লিওপ্যাট্রার নাসাগ্র, দেহসুবাস, নখরশ্রী, ত্বকের অবক্ষয়, আপনি কি চমকেছেন? বয়সের রেখা পড়লো নাকি? ৩৭·৪% বেশি, সাম্য ও সৌন্দর্য, রূপ আপনার নিজের হাতে, চাকুরে মেয়ের চাহিদা, বৈকালিক কালিমা, পারফিউম বাঁচান! কাজের কোলকলে হাজির?···হালফিল জাল

রেখে-রেখে কেমন তার স্টাইল বদলেছে। রকমারি খুব : খোশামুদে, উঁচকপালে, ঘরোয়া, ঘ্যানঘেনে, গম্ভীর; কাব্যিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, হিতোপদেশ, গল্প ক'রে বলা, অল্প ক'রে বলা, তেলতেলে বলা; চেঁচিয়ে, খুঁচিয়ে, চোখ টিপে, চোখ রাঙিয়ে বলা; বোকা সেজে, সখী সেজে, জ্ঞানী সেজে, ইস্তক মাইক্রোস্কোপের গা ছুঁয়ে বলা। কাকে? অর্ধনারীশ্বরের প্রথমার্ধকে। কথাটা কী? আমার মাল কিনুন। মাল? যা চান! সাবান-তেল তো ঠাকুমার ঝুলি, আমাদের কাছে সব পাবেন, গালের ঠোঁটের হাতের নখের ভুরুর জন্য বেবাক; আবার চোখ চকচকে রাখার, চোখের পলক লম্বা করার, নাকের ডগা শুকনো রাখাব আলাদা-আলাদা দাওয়াই পাবেন। আর কী চান? বাড়তি চুলের মলম? আপনারা আগে ব্লাউজের হাতা ছাড়ুন, তবেই হবে। দিশি কোম্পানির মধ্যে আমরাই সবচেয়ে প্রোগ্রেসিভ, জানেন তো।

নিশ্বাস ফেলে ফাইল বন্ধ করলো। কত বুদ্ধি, কত সময়, কলমের কত কসরৎ এতে খেলিয়েছে! দেবীদাস খবরকাগজে, কেউ-কেউ সিনেমায়। আমরা সবাই পতিত।

পরেশ লাহিড়ীর কাজটা এখন ধরতে হয়। সময় কই? রাত জেগে। যে ক'রে হোক, করাই চাই। ক-দিন ছুটি দেয় না আপিশ? কিন্তু এই অ্যানুএল প্রোগ্রামের সময়?...তার উপর স্পেশল ফেডার... গাঙ্গুলির কথাটা আজ রাখলেই হ'তো। ঘণ্টাখানেক তো দেরি? না, মালতী সেন আশা ক'রে ব'সে আছে।

আশা ক'রে? ছি!

হাতঘড়ির দিকে পলকপাত ক'রে সোমেন সিগারেট ধরালো। বাঁ হাতে একটু চাপলো ভিতরপকেট। দু-শো টাকার বাণ্ডিল।

আর লাহিড়ীর টাকা পেলে—প্রথমেই মীরাকে তার জমির জন্ত পাঁচশো, আরো পাঁচশো সংসারে। একবার—এতদিনে একবার—সব টানাটানি মিটুক। মশারি, নতুন লেপ, সোফার মেরামত, বাড়ির টনসিল, বুলবুলের ফ্রক···সেখানে যা-কিছু দরকার সব হবে এবার। বাড়ি-ভাড়া শোধ। নিশ্চিন্ত। অন্তত দম ফেলার ফুরসৎ।

বাকিটা ব্যাঙ্কে। কিছু মীরাকে লুকিয়ে। এই দু-শো পুরোতে হবে সামনের মাসে, আর মালতী সেনকে—কী করবে? তা যদিন কোনো সুবিধে না হয়···না-খেয়ে মরতে পারে না তো। গণেশ ব্যাঙ্ক ফেল প'ড়ে কী-কাণ্ডই হ'লো! তা কাণ্ড যা-ই হোক, তোমার তাতে কী? কতটুকু চেনো তুমি তাকে? কী জানো তার কথা? আত্মীয়স্বজন আছে না তার?—তারা দেখবে। আর দেখুক বা না দেখুক, তাতে তোমার তো কিছু না!

আমি-যে তাকে দেখেছি। আমি-যে তার চোখের বিষন্নতা দেখেছি।

কিন্তু কী পারো তুমি? কতটুকু পারো? নিজের কথা ভাবো না?

আমার? আমার ভাবনা! এই-তো এক কথায় পাঁচ হাজার। দেখলে আমার জমির পয়া! মীরা যতই লাফাক, আমি তো জানি। বলেছিলাম ভাবনা কী, কথা দিয়েছিলাম সোমবার সন্ধ্যাবেলা—তাই। এটা মিটলেই 'বিশ্বরূপে'র কলামটা নিয়ে নেবো, আর গাঙ্গুলি যদি ফিরে···। হ্যাঁ, সব নেবো, সব করবো, মালতী সেনকে আমি বাঁচাবো।

কী, সোমেনবাবু? মেজাজ খুব শরিফ দেখছি! টাকার গন্ধে আনচান? শরীর যেন হালকা, জোর বেড়েছে, আর বেশ-তো সাহস দেখালেন গাঙ্গুলিকে, কেশিয়ারকে। আর আপনার ঐ গল্পটাকে

কেমন চটকে-চটকে দিব্যি রসগোল্লাটি বানাবেন, তাও তো ভেবে ফেলেছেন দেখছি!

সোমেন সিগারেটটা দুমড়ে ফেলে দিলো। আমিও ছোটোলোক।

উপায় কী? স্ত্রী, সন্তান, সংসার; মালতী সেন। সত্যি, আমার কী? ছাড়ো, সব ছাড়ো, চাকরি ছাড়ো, স্ত্রীপুত্র ভাসিয়ে দাও। ভেঙে বেরিয়ে পড়ো যেদিকে চোখ যায়, যা খুশি করো, কিছু ভেবো না। তোমার কিছু বলার আছে: বলো।

পাগলামি! মানুষ কি তার অবস্থা কাটাতে পারে? মেনে নাও, মানিয়ে চলো, ওরই মধ্যে যা পারো করো। বেশি হবে না, তোমার তৃষ্ণায় এক চুমুকও জুটবে না, তবু-তো আধ চুমুক। তৃষ্ণায় পোড়ো, যন্ত্রণায় জলো, ইচ্ছায় শুখাও। সে-ই তোমার প্রমাণ।

তৃষ্ণা যদি ম'রে যায়? যন্ত্রণায় যদি সুখের প্রলেপ পড়ে?

সুখ? আরাম? টাকা?…তা-ই যদি হয়, তবে-তো তুমি বাজে, তবে-তো তুমি কিছুই না। তাহ'লে আর আপশোষ কিসের।

কিন্তু বুঝবো কী ক'রে? আমি কী, কী পারি, পারি কি পারি না, তা জানতে হ'লেও তো নিজের মন নিয়েই প'ড়ে থাকতে হয়।

থাক এ-সব। লাহিড়ীর কাজটা ক'রে দাও আগে। যা ফাঁপরে পড়ছিলে, লাহিড়ী রক্ষা করলো। কিন্তু ঠিক তো? আসবে তো? ব'লে-তো গেলো নিশ্চয়ই। অমন কত ব'লে যায়, শেষটায় ফুটফাট। বিশ্বাস কী, এদিকে সেই ভরসায় দু-শো টাকা আগাম নিয়ে বসলাম!

না, আসবে। অতক্ষণ ব'সে অত কথা বললো—কথা একটু বেশি বললো না? আর বড্ড বন্ধুভাব! তা মীরার ছেলেবেলার বন্ধু—সে-ই তো! মরমার সঙ্গে গপ্‌পো, চা-বিস্কুট খাওয়া' আর ব্যাখ্যরাং—

না, এটা তোমার অন্যায় হচ্ছে। কাজেই এসেছিলো, সত্যি বই চায়, নয়তো—কই, এতকালের মধ্যে তো আসেনি।

ঠিক, সবই ঠিক, কিন্তু যদি শেষ পর্য্যন্ত—এমন কত কিছুই তো হ'তে-হ'তেও হয় না। যদি না হয়, যদি না হয়—

সোমেনের মনের মধ্যে কে যেন টুক ক'রে ব'লে উঠলো: না হ'লে বাঁচি। মুহূর্ত্তের জন্য সোমবার থেকে শনিবারে ফিরে গেলো সে, পাঁচ-হাজারের ভরসা থেকে মীরার চীৎকারে, উত্তম থেকে হতাশায়, আপোশের মসৃণতা ছেড়ে প্রখর আত্মাভিমানে। হঠাৎ উঠে এলো কথা, মনের কথা, কবিতা। আস্ত লাইন! এত জোরে ধাক্কা দিলো যে সোমেন যেন ভয় পেয়ে স্তব্ধ হ'লো। এ-ই তো, এ-ই তো তার কথা, এ-ই তো সে বলতে চায়। বেরিয়ে এসেছে চোখের সামনে, জ্বলজ্বলে। অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকলো একটুক্ষণ, তারপর আলগোছে, যেন নিজেকে লুকিয়ে, একটা ছেঁড়া খামের পিঠে পেনশিলের প্যাঁচালো অক্ষরে—কিন্তু লেখামাত্র মনে হ'লো ঠিক না। না হোক, কাছাকাছি। যদি একটু চুপ ক'রে থাকে, শুধু একটু চুপ ক'রে থাকে—সবুর, আর-একটু সবুর, এর পরে সময় হবে।

ছেঁড়া খামটা পকেটে পুরে উঠে দাঁড়ালো। পাঁচটা। আর এক মিনিট না। টেবিলে-টেবিলে অন্যেরা যতক্ষণ দেরাজ টানছে, ফিতে বাঁধছে, হেলান দিচ্ছে, সোমেন ততক্ষণে ট্র্যামে।

৮

আস্তে ঠেলা দিতে দরজা ফাঁক হ'লো, ঘরে এসেই থমকালো! অন্ধকার লাগলো প্রথমে, কিছু দেখতে পেলো না। তারপর ছায়ার তলা থেকে আস্তে ভেসে উঠলো পাঁচটা দেয়াল, দেয়ালের তাকের কালো ফোকর, উঁচু-করা ট্রাঙ্ক-বাক্স, ছিটিমোড়া তানপুরো। গড়ন শুধু আলাদা, রং সব এক। মরা সন্ধ্যায় সবার শেষে মালতী সেনকে দেখলো। শুয়ে আছে। একটি হাত কপালে, অন্যটি পাশে এলানো। তোলা হাতের কনুইয়ের খাঁজ চোখে পড়লো, এলানো হাতটি জ্যামিতিক রেখার মতো নিঃসাড়। মুখ নেই, চোখ নেই, শুধু ছাঁচ, ফাঁপা গড়ন, ছায়া। শুয়ে আছে সমর্পণের ভঙ্গিতে, পরম সমর্পণ, সেখানে প্রার্থনাও বেয়াদবি। আরো বেয়াদবি তার দিকে তাকানো।

সোমেন চোখ নামালো, নড়তে পারলো না। এখনো দেখতে পায়নি? ভারি অসাবধান তো, ঘরে যদি চোর। উচিত ছিল দরজায় খিল। আমার, টোকা। এখন একটা আওয়াজ-টাওয়াজ। না কি ফিরে যাবো? কিন্তু তা-ই বা কেমন? উচিত না, আমি এখানে উচিত না।

ত্রস্ত মৃদু আওয়াজে চোখ তুললো। ব'লে উঠলো 'আমি! আমি সোমেন দত্ত!' পাছে অন্ধকারে না চেনে। বিকৃত শুনলো নিজের গলা, যেন সে-ই ভয় পেয়েছে।

কেউ জবাব দিলো না, কেউ উঠলো না। ভদ্রমহিলা!—তার শোওয়া, তার শোওয়া ছেড়ে ওঠা, দুটোই গোপনীয়। সোমেন বাইরে এসে দরজা ভেজিয়ে সিঁড়িতে দাঁড়ালো। পাশের দোতলায়

মেয়ের মুখ জানলা থেকে স'রে গেলো, তারপর একজনের বদলে দু-জন এসে দাঁড়ালো।

সোমেন মুখ ফিরিয়ে ন্যাড়া আকাশের চিলতে দেখলো, যতক্ষণ-না পিছন থেকে গলা শুনলো, 'আসুন।'

এখন সব আলাদা। আলো জ্বলছে, তক্তাপোশে টান সুজনি, সব দিনের চেয়ে সুশ্রী মালতী সেন। শাড়িটা লক্ষ্য করলো সোমেন, সবুজ বুটিতোলা .শাদা, আগে পরতে ছাখেনি। এই শাড়িতেই শুয়ে ছিলো? না, ভাঁজ-ভাঙা। কত অল্প সময়ে কত বদল ঘটাতে পারে মেয়ের হাত! তখন—একটু আগে—যে-সত্যে ধরা পড়লো, কেমন ক্ষিপ্র হাতে মোলায়েম মিশিয়ে দিলো পরিচ্ছন্নতার তুচ্ছ পরিণামে। সেই অন্ধকার অন্তরঙ্গতার মুহূর্তটি অলীক হ'য়ে গেলো ইলেকট্রিকের আলোয়, প্রফুল্ল শাড়িতে। শুধু স্মৃতি থাকলো, কিন্তু স্মৃতি থাকলো।

সোমেন টিনের চেয়ারটায়, আর মালতী বসলো তক্তাপোশের ধার ঘেঁষে ঠিক সেদিনের মতো। 'অসময়ে শুয়েছিলেন?' 'আপনার অসুখ করেছে?' 'ঘুমুচ্ছিলেন?' ভোঁতা সব প্রশ্ন, সোমেন ঠোঁট থেকে ফিরিয়ে দিলো। কী ভাবছিলো? কার কথা? তার মৃত স্বামীর? হঠাৎ ঈর্ষার কামড় দিলো সোমেনের মনে।

একটু পরে মালতীই কথা বললো। 'আপনি আপিশ থেকে?'

'হ্যাঁ, আপিশ থেকে। ছেলেরা কোথায়?'

'বেড়াতে গেছে লেকের দিকে।'

'পাড়ায় বুঝি বন্ধু হয়েছে?'

'তেমন আর কই। নিজেরাই গেছে।'

এর পর? সত্যি যখন কিছু বলার থাকে তখনই কথা জোটে না। তাই তো কবিতা লেখা এত শক্ত।

অগত্যা ছেলেদের কথাই আবার। 'আপনার ছেলে দুটি খুব ভালো। পড়াশুনোয় কেমন?'

'আছে একরকম।'

'একরকম কেন? না, না, খুব ভালো হবে দেখবেন। কেমন পড়ে চুপচাপ ব'সে-ব'সে!' বলতেই গৌতমকে আবার মনে পড়লো। তার ছিপছিপে চশমা-পরা চেহারা, তার চোখা নাক, তার শান্ত চোখ মনে পড়লো। অত বুদ্ধি, উৎসাহ, অধ্যবসায়—কিন্তু আজ কি কেউ মনে রেখেছে? তার স্ত্রী? সন্তান?······কিন্তু কতটুকু? মনে রাখার সময় কই এই নিষ্ঠুর জীবিতলোকে? না, না—সোমেনের মনে প্রবল কথা উঠলো—ম'রে যাওয়াটা ঠিক না, যতদূর সম্ভব বেঁচে থাকার চেষ্টাই যেন করে প্রত্যেকে।

'দেখা যাক।'

সোমেন চমকে তাকালো। বেঁচে থাকা কতদূর সম্ভব দেখা যাক? না, উনি ছেলেদের কথা বলছেন। তাদের পড়াশুনো। সোমেন আবার অনর্থক বললো, 'হ্যাঁ—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই ওরা ভালো হবে।' এ-সব তুচ্ছতায় আরাম আছে কিন্তু।

মালতী উঠলো, দেয়ালের তাকের কাছে দাঁড়িয়ে চামচে পেয়ালা তুলে নিলো। মন দিয়ে তার ধীর, সচেতন নড়াচড়া দেখতে-দেখতে সোমেন বললো, 'আমি কিন্তু চা খাবো না।'

'আপিশ থেকে এলেন, একটু—'

'না।'

মালতী একটা ঠোঙায় উঁকি দিলো।

'আমি চা খাবো না!'

জোরে বেরোলো কথাটা, রূঢ় শোনালো। রাগ, রাগের ধোঁয়ানো

আঁচ সোমেন বুঝলো গলা ঠেলে উঠছে। সে কি ক্লুনিংরুমের বকবকম পায়রা? ভব্যতায় পাওনাদার? চা খেতে গল্প করতে এসেছে? কিন্তু তা-ই তো। তা ছাড়া আর যা—সেই তার বেনামী সত্তা শুধু তার নিজের মনেই জন্মেছে, আর কোথাও এই রাগের আশ্রয় নেই। তাই বেসামাল।

সোমেন ডাকলো, 'শুনুন।'

খয়েরি পরদার সামনে সবুজ বুটি থামলো। মালতী চোখ ফিরিয়ে আবার বললো, 'চা একটু খান।'

সোমেন জরুরি গলায় জবাব দিলো, 'সময় নেই। শুধু একটা কথা বলতে এসেছিলাম।'

একটু থেমে থেকে মালতী ফিরে এলো। হাতের জিনিশ তাকে নামিয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো। যেন বাধ্য, সোমেন ভাবলো, নিরুপায়। হঠাৎ খারাপ লাগলো তার, নিজেকে খারাপ লাগলো।

'কেমন আছেন?'

মালতী কথা বললো না। মামুলি—সোমেন ভাবলো—জবাব দিতে হয় না, লক্ষকোটি মুখে-মুখে নিত্যবলা এমন মামুলি আর কোন কথা? আর হঠাৎ হাতুড়ির মতো এমন বুকভাঙা আর কোন কথা, যখন পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে বলেছে সে কেমন আছেন?

কবিতার আঘাতে কেঁপে উঠে একটু চুপ ক'রে থাকলো সোমেন। তারপর সেই কথাই আবার জিগেস করলো।

এবার মালতী বললো, 'ভালো আছি।'

ভালো? সোমেন চোখে চোখ ফেললো। 'গণেশ ব্যাঙ্কের খবর কী?' কথাটা শোনালো প্রায় ঠাট্টার মতো।—অভদ্র! নিজেকে গাল দিলো মনে-মনে।

'খবর আর কী।' হঠাৎ মালতীর আড়ষ্টতা কেটে গেলো, হালকা ক'রে বললো, 'ট্যুশনি আর-একটা পেয়ে গেছি।'

ঐ খুশি গলার অপমান এক ঢোঁকে গিলে ফেললো সোমেন। 'তা—আপাতত ?'

'আপাতত চ'লে যাবে।'

চ'লে যাবে। একটু দ্বিধা নেই জবাবটায়, নিশ্চিন্ত। ঠিক, গয়না আছে। 'আরে গলা যত শুকোয় আসলে কি তত!' বোকা—! কবিমশাই, স্ত্রীর কথা শুনে সংসারে চলুন, তাতে আপনার ভালো হবে।

সোমেন হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।

'যাচ্ছেন ?'

চোখের পাতা কাঁপলো নাকি, ছায়া করলো চোখ ? ভুল! সব ভুল, কল্পনা। আমি বেকার, বেদরকারে হাজির। অদ্ভুত, গোপন, অকথ্য ব্যর্থতায় সোমেনের দমবন্ধ হ'লো। এ-দুদিন অন্য কিছু সে ভাবতে পারেনি, আপিশে আজ কেমন ক'রে টাকা নিলো, কেমন ছুটে এলো এখানে, আর এরা—এরা বেশ আছে, ট্যুশনি পেয়েছে, ছেলেরা গেছে লেকের ধারে বেড়াতে।

সোমেনের চাপা গলার মোটা আওয়াজ বেরোলো: 'আপনি গেলেন না ?'

'—কোথায় ?'

'লেকে বেড়াতে গেলেন না ?'

মাথা নিচু হ'লো, ধবধবে সিঁথিটা সোমেনের চোখের সামনে ফুটলো। ভদ্রতার ভালোমানুষি নকল ক'রে বললো, 'বিকেলে একটু বেড়ানোই তো ভালো।'

মালতী মুখ তুলে চুপ ক'রে তাকালো। কী বলতে, কী না-বলতে

তার? চোখ, মনের স্বচ্ছ বিখ্যাত আয়না, সেখানে কি এই ক্ষয়াটে বিষণ্ণতা ছাড়া কিছু নেই? এই সহিষ্ণুতার আত্মলীন আভা—শুধু এই নিয়ে তাকে ফিরতে হবে?

এক টানে সোজা হ'লো সোমেন। ফিরতে হবে, ফেরৎ যাবে। গণেশ ব্যাঙ্ক ফেল প'ড়েও সহজ হ'লো না। 'আমি যাই এখন।' চাইলো কড়া গলায় বলতে, কিন্তু নিজের কানেই মিনতির মতো শুনলো। 'যাই। কেমন আছেন তা-ই দেখে গেলাম একবার।' মুখের উপর মালতীর চোখ অনুভব করলো, নিজের চোখ স্থির করলো তার একটি হাতের উপর, কত কাজের হাত, স্বাবলম্বী, রূপান্তরে নিপুণ, তবু ভঙ্গুর, ম্লান করুণ নিরুদ্যমে দুটি আঙুলে শাড়ির প্রান্ত ছুঁয়ে আছে। মনে কথা উঠলো, 'ভালো থাক, ভালো থাক, আর-কিছু চাই না'—মিথ্যা! ভালো থাকলেই হ'লো না, আমি ভালো রাখবো। আমার চেষ্টা, আমার কষ্ট, কোনো-এক খুব ছোটো সকলের অজানা জায়গায় আমার জিৎ। নয়তো কতই যারা ভালো আছে পৃথিবীতে—আমার কী?

নিজের মন এমন স্পষ্ট ক'রে আগে আর দেখতে পারেনি সোমেন। প্রতারণার কত স্তর দিয়ে মানুষের মন তৈরি হয়েছে, বলো তো? কিন্তু আর না, পালাও, ঐ নির্ভরহীন, নির্ভরশীল মানুষটির জীবনযুদ্ধ আর জটিল কোরো না, সেটাই তার সত্যিকার সবচেয়ে ভালো। সোমেন স্তব্ধ হ'য়ে থাকলো একটুক্ষণ, তারপরেই দেখলো সে বাইরে চ'লে এসেছে।

কিন্তু সিঁড়িতে এসেই থামলো। গলিটা অন্ধকার, কোন বাড়ির উনুনের ধোঁয়া নিশ্বাসের গলায় পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ফাঁস টেনেছে। ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি থেকে বোল উঠছে নানান রকম। গিন্নী-ঝির ঝগড়া, শিশুর কান্না, রেডিওর ঝুমঝুম, পড়া-মুখস্থর চ্যাঁচানো—সব একসঙ্গে।

প্যাঁচালো এই কলকাতা, কেবল কাটাকুটি, ঠোকাঠুকি, কারো সঙ্গে কারো মেলে না, যত মাইল রাস্তা হাঁটো, কোথাও পৌঁছবার নেই। এর মধ্যে মালতী ? ছায়ায় মিশে গিয়ে যে শুয়ে ছিলো, সে-ই ?

—মূর্খ ! নিজের উপর রাগ ক'রে তাকে তুমি ছুঁড়ে দেবে প্রয়োজনের প্রকাণ্ড ওজনের তলায় ? তোমার সাবধানী ভালো হ'য়ে থাকার মূল্য কি এতটাই ?

সোমেন সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই পকেট থাবলে নোটের বাণ্ডিল তুললো, মুঠোয় চেপে আবার ঘরে এলো। যেখানে শেষ দেখেছিলো, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে মালতী, মাথা নিচু ক'রে, যেন কিছু ভাবছে। পায়ের শব্দে মুখ তুললো।

'এই এটা—এটা—আমি এনেছিলাম।'

সোমেনের হাতের মুঠোয় মালতীর চোখ পড়লো। যেমন সুইচ টিপলে ইলেকট্রিক বালবে আলো ছুটে আসে, তেমন দপ ক'রে তার মুখ লাল হ'লো।

'রাখুন।'

মালতীর ঠোঁট নড়লো, কিন্তু আওয়াজ বেরোলো না।

'নিন !' সোমেন ছেঁড়া গলায় চেঁচিয়ে বললো, যেন ধমক দিয়ে, হুকুম ক'রে।

মালতী নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে।

সোমেনের হাত ঢেউয়ের মতো লাফিয়ে নামলো নৌকোর মতো করুণ একটি হাতের উপর, অন্ত হাতের নোটের গোছা সেখানে রেখেই ছিটকে সে স'রে এলো।

অনড় হ'য়ে থাকলো হাতটি, নিঃসাড়। একটি মুহূর্ত সময়ে ঝুলে থাকলো। নৌকো কি ডুবে গিয়ে নতুন যাত্রীদের নদীর স্রোতকে

ভাসিয়ে দেবে, না কি চারদিকের দাঁতওলা জলের উপর দিয়ে টাল সামলে রওনা হবে আবার?

দুটোর একটাও হ'লো না। হঠাৎ চাপা আওয়াজ উঠলো, গলা-টেপা অদ্ভুত চীৎকার, কোনো ফাঁদে-পড়া নিরীহ জানোয়ারের ডাকের মতো, বোবার কথা বলার চেষ্টার মতো। ঘর ছেড়ে যেতে পারলো না, ফিরে দাঁড়াতেও পারলো না; ঐখানে, মুখোমুখি, হাতের ভাঁজে মুখ ঢেকে, আদিম নির্বোধ জন্তুর ভাষায় সব জানিয়ে দিলো মালতী সেন, কিছু লুকোতে পারলো না, নগ্ন হ'য়ে সামনে দাঁড়ালো।

কিন্তু সোমেন আর দাঁড়ালো না। অজানা শহর, অচেনা পথ, কার্তিকের ধোঁয়ার আর কুয়াশার চাপে রাস্তার আলো লালচে, কম-কম। ঘুরতে-ঘুরতে কখন ট্রাম-লাইন—কোথায়? ঐ তো বালিগঞ্জ স্টেশন। চোখ দিয়ে খুঁজে-খুঁজে ট্রাম-স্টপে এলো। হাত দুটো ভারি হ'য়ে ঝুলছে। ছিনিয়ে এনেছে তাপ, নতুন তাপ, আঙুলের ডগা পর্যন্ত ভারি। এই লজ্জাতেই তার জিৎ।

৯

৪ নবেম্বর, মঙ্গলবার

'জন্মান্তর' প'ড়ে উঠলাম। প'ড়ে অবাক, আবার মন-খারাপ। তেইশ বছরের বাচ্চার পক্ষে বাহাদুর বই। মানুষের মনের এত কথা আমি তখনই জানতাম! সব কি জেনে লিখেছিলাম, নিজেই বুঝেছিলাম নিজে কী বলছি?

(অভিজ্ঞতা মানে ঘটনা, ঘটনা মানে যা-কিছু আমরা দেখি, শুনি, বলি, পড়ি, ভুগি, ভাবি, বাঁচি। নিজে বাঁচবো, বেঁচে জানবো, তবে লিখবো—তা-ই যদি হ'তো, তাহ'লে কি চুল না-পাকলে কলম ছুঁতে পারতো কেউ? কিন্তু অন্য-কিছু আছে, সহজ বোধ, নিজের না-জানা ভিতর-চোখ। সে-চোখ প্রথম থেকেই সব দেখেছে, একসঙ্গেই সব জেনেছে। সেটা থাকলে বাচ্চা ছেলেও জ্ঞানী, না-থাকলে পাকা চুলেও বোকা।

শিল্পীদের সেখানে থেকেই রওনা; তাঁরা জাতিস্মর।)

মন-খারাপ, কেননা ভালো একটা বিষয় নিয়ে নষ্ট করেছি। ধরেছিলাম ঠিক, কিন্তু ধ'রে রাখতে পারিনি, শেষটায় এলিয়ে গেলো। কবি, তায় যুবক, তার লেখা উপন্যাসে যত দোষ সম্ভব, সব ক-টা প্রবলভাবে হাজির। বড্ড বেশি, সমস্তটাই বড্ড বেশি বলা। আরো খারাপ: লেখকই সব ফাঁশ ক'রে দিচ্ছে, পাত্রপাত্রী যেথায় ঝোঁকে 'হ'য়ে উঠছে' না। জলের তলায় মানুষ যেমন অস্বাভাবিক, অস্পষ্ট, এখানেও তাই তেমনি। অথচ কবিত্বের সেই বাধ্যতা নেই, যা

জলের তলেও প্রাসাদ তোলে। প্রাকৃত হবার, বাস্তব হবার ইচ্ছার কাছে কবিত্ব হেরে যাচ্ছে। এটা রুচির পতন, শিক্ষার ত্রুটি।

আমার শিক্ষা তখন যথেষ্ট ছিলো না, সাহিত্যের শিক্ষা যথেষ্ট ছিলো না। অভিজ্ঞতা কম ছিলো, সাহিত্যের অভিজ্ঞতা কম ছিলো। ভাবতে শিখিনি। ছিলো জ্বালা, শুধু আবেগের জ্বালা। বইটা তাই দগদগে লাল, সেই লাল রংটাই লোকের চোখে লেগে আছে।

যদি পারতাম এটা নতুন ক'রে আবার লিখতে! অদল-বদল না, একেবারে অন্য বই। বইটার একটা পথ দেখতে পাচ্ছি; যা বলতে চাই, যা তখনো, নিজে না-বুঝে, বলতে চেয়েছিলাম, সেই কথার বেরিয়ে আসার পথ। কী হবে? কে শুনবে? আছে নিশ্চয়ই শোনার লোক, নয়তো আমি কেন বলার জন্য পাগল? একলা খাপছাড়া কিছু নই তো আমি, অন্যদের মতোই মানুষ।

হ্যাঁ, আবার লেখো, নতুন করে লেখো। মায়া কুমারী হোক, বরং বাসন্তী ভালোর-ভালোয় ম'রে যাক, বিপত্নীক অমল দার্শনিকমুখে বিয়ে করুক। তারপর? তারপর তার তিন বছরের খোকা—কেন, খোকা কি থাকতে নেই?—মা ব'লে ঝুলে পড়ুক দেখামাত্র মায়ার গলায়। একেবারে অন্য বই।

পরেশবাবু, পছন্দ হয়?

একবার পরামর্শ ক'রে নিলে হ'তো, কিন্তু লাহিড়ী তো ভাগল বা। কাল আসেনি। লোকের হাতে তার চিঠি এলো। জরুরি টেলিগ্রাম পেয়ে বম্বাই। দিন-দশ কাটবে সেখানে, জোর পনেরো। ফিরে এসেই শুরু করবে, কিছু লেখা তৈরি পাবে তো? বিস্তর খরচ ক'রে নামছে, আমিই এখন ভরসা, ঠিক সময়মতো চাই কিন্তু। টাকার জন্য আমি যেন না ভাবি, অল পাকা—এখন,

তাড়াহুড়োয় কিছু করা গেলো না—ফেরামাত্রই সব হবে। ময়নার ছেলেমেয়েকে যৎকিঞ্চিৎ উপহার তাদের মামার।

এন্তার টফি পাঠিয়েছে, ছবি-আঁকা চ্যাপ্টা টিনের বিলিতি বিস্কুট। বাপ্টির বহুদিনের সাধ।

আজ বইটা প'ড়ে নিলাম, কাল থেকে লেখা। রাত্রে ছাড়া সময় নেই।

৫ নবেম্বর

দিন আরো ছোটো, শীত প'ড়ে এলো।

আজ আপিশে যাওয়ামাত্র গাঙ্গুলির ঘরে ডাক পড়লো।

'এই যে সোমেনবাবু, আসুন।' (সন্দেহজনক সহৃদয়তা।)

'কাল আমি তিনবার—'

'আমি কাল ফ্যাক্টরিতে ছিলাম। সোমবার একবার ডেকেছিলাম আপনাকে।'

'শুনলাম। আমি পাঁচটার পরে আর ছিলাম না।'

'খুব তাড়া ছিলো, না? বাড়িতে কাজ ছিলো?'

'সে-জন্য না। পাঁচটায় ছুটি, তাই।'

গাঙ্গুলি একটা পেনসিল হাতে তুলে তার অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করলেন।

'তাও আমি দেখুন ছ-টার আগে একদিন বেরোতে পারি না। আর আপনারা ভাবেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হওয়াটা কত সুখের।'

'আমি তা ভাবি না।'

'না, আপনি তা ভাবেন না। আপনি বরং দুনিয়ার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরদের দয়ার চোখে ভাখেন। বেচারার দল! রবিঠাকুর

আওড়ায় না। কবিতা বোঝে না। তবে এসে করলো কী?' (হলদে দাঁতের হাসি ফুটলো ঝিলিক।)

'ঠিক উল্টো। তাদের একজন হ'তে পারলাম না, নেহাৎ সুখে দিন কাটলো, সেই-তো আপশোষ।'

(মিথ্যা। চাটুবাক্য।)

'আর আমাদের আপশোষ দেশের একজন বিখ্যাত কবির মূল্যবান সময় বাজে-বাজে বিজ্ঞাপন লিখিয়ে নষ্ট করছি।'

'আমার কাজ কি আপনার পছন্দ হচ্ছে না?'

'পছন্দ? দেশ ভ'রে আপনার বিজ্ঞাপনের সুখ্যাতি। পদ্ম কেমিক্যালসকে আপনি জাতে তুললেন। কিন্তু পদ্ম কেমিক্যালস-এর উন্নতিতে আপনি কি সুখী? তার দুর্দশায় আপনার দুঃখ? আপনি চাকরি করেন; আজ এখানে, পঞ্চাশ টাকা বেশি পেলে কাল অন্য কোথাও।'

'সোমবার সেই ড্রাফটটা পাঠিয়েছিলাম। দেখেছিলেন?'

'দেখলাম।'

'ঠিক আছে?'

'আমি কমপ্লীট প্রোগ্রাম চেয়েছিলাম না?'

'তাতে সময় লাগবে।'

'ক-দিন বলুন তো?'

'বরাবর তো—'

'এবার তাড়া আছে। আপনি আমাকে শুক্রবার দিতে পারেন?'

'এই শুক্রবার? পরশু?'

'আচ্ছা—যতটা তাড়াতাড়ি হয়। আপনার উপর চাপ দিতে খারাপ লাগে—বুঝি তো, এ-সব হ'লো আপনার পক্ষে দিনগত

পাপক্ষয়, কোনোরকমে পাঁচটা খাজনে বাঁচেন, আর আমরা সাধারণ সংসারী লোক, আমাদের এই ধ্যান, এই জ্ঞান, এই জীবন। তার উপর অবস্থা যা ক্রমশ দাঁড়াচ্ছে, চোখ ট্যারা হবার জোগাড়। দেখুন না, আমাদের ডাইরেক্টর্স বোর্ড কেমন ছেঁটে দিলো পাব্লিসিটির বাজেট।'

'দেখছি তো।' (চোখ ট্যারা হওয়াটা বেশ বলেছে!)

'হাবভাব যেমন দেখছি তাতে পাব্লিসিটি অফিসারের আর দরকার নেই, এ-রকম কথা উঠতেই বা কতক্ষণ। একজন ডাইরেক্টর তো বললেন সেদিন যে কেরানি দিয়েই কাজ চালানো যায়।'

'নিশ্চয়ই! শো-পাঁচেক বিজ্ঞাপন তো মজুত আছে, এখন নিরঞ্জন স্বচ্ছন্দে পারবে।'

'আমার তা মত না। বিজ্ঞাপনে নিত্যনতুন চাই। আর তার জন্য চাই মগজ। তাছাড়া আপনার নামেরও দাম আছে। অবশ্য উচিত দাম আমরা দিতে পারছি না—তা আপনিও আমাদের দিকটা দেখবেন। এই-তো বোর্ড-মীটিঙে ঠিক হ'লো একজন লেবার অফিসার নিতে হবে। সাতশো পর্যন্ত মাইনে, ডি-এ, কারখানায় কোয়াটার্স ফ্রী। কী দরকার ছিলো, বলুন? দরকার এই যে আজকাল আমাদের মজুর-রাজাটিকে তোয়াজে রাখলে তবে অন্য কথা।'

'ঠিক!'

'আর আপনার ইনক্রীমেন্টের কথাটা এবারেও এইজন্য চাপা পড়লো। এখন ধরুন আপনাকে যদি লেবার-অফিসার করতে পারতাম! কিন্তু ওখানে তো কথার ভেলকিতে চলবে না—হার্ড ফ্যাক্টস নিয়ে কারবার!' (হলদে দাঁতের ঝিলিক।) 'আপনার জানাশোনা কেউ আছে নাকি তেমন? মজবুত মানুষ? স্টং পার্সন্যালিটি?'

'কই, মনে তো পড়ছে না আপনার সেই ফিল্মের কন্দুর?'

'ফিল্ম? ও-সব এখন...' (চোখ কাচের মতো হ'লো) 'দেখুন ঐ প্রোগ্রামটা যত শিগগির...'

এত ভক্তি গাঙ্গুলির উপর কখনো আমার হয়নি, আজ যত। কেমন আদর ক'রে কান মললো! আমি কুঁড়ে, নিষ্কর্মা, ফাঁকিবাজ, আমার পার্সন্যালিটি নেই, আপিশ আমাকে দয়া ক'রে এখনো রেখেছে, কিন্তু ইনক্রীমেন্ট আমার আর হবে না, এখন থেকে সাবধান না-হ'লে চাকরি যাবে। সব বলা হ'লো, কিন্তু এমন একটি কথা না, যাতে দোষ ধরা যায়। আর দোষ যদি কিছু হয় তো অদৃশ্য, অনুপস্থিত, অনধিগম্য ডাইরেক্টর্স বোর্ডের, গাঙ্গুলি বেচারার হাত কী? ওঃ, তুখোড়!

ফিল্মের কথায় বাক্সের মতো বুজে গেলো। তা যাক, জয়তু পরেশ। কিন্তু...কই, টাকা তো পাঠালো না। চিঠি লিখলো, টফি-বিস্কুট কিনতে পারলো, আর একটা চেক সই করার সময় হ'লো না? মীরা বলছে কিছু ভেবো না, জ্ঞজদা মানুষ খাঁটি, ঠকাবে না—আর সব সময় ও-রকম টাকা-টাকা কোরো না তো! তার দাদার বাড়িতে সগৌরবে খবরটা দিয়ে এসেছে। বীরেশ লাহিড়ী পয়সা করেছে খুব, আর কথা দিলে কথা রাখে, এই হ'লো শ্রীপতিবাবুর সার্টিফিকেট। কিন্তু বীরেশ তো না, পরেশ। আরে ঐ হ'লো, দু-ভাই কি আলাদা? এটা আলাদা হ'য়ে করছে, বললো না? তাতে কী, ভাই তো বীরেশেরই, আর চেনাশোনার মধ্যে—দাদা ওদের সব খবর রাখে। কিন্তু—। কিন্তু-টিন্তু ছাড়ো, একমনে লিখতে ব'সে যাও।

ব'সে যাচ্ছি, আপিশ-ফেরৎ চা খেয়ে সন্ধেবেলা, আবার রাত্রে যতক্ষণ সিগারেট দিয়ে ঘুম ঠেকানো যায়। কিন্তু একমনটা

মুশকিল। সোমনা ছেড়ে তেমনা চৌমনা হ'য়ে যাচ্ছি। মীরাকে বললাম তাহ'লে তোমার অন্নদা এলেই জমির টাকা। না, তা হয় না, সোমবার শেষ তারিখ। নয়তো? নয়তো বাজেয়াপ্ত। আর এখন তো ভাবনা ঘুচলো—আপাতত চালিয়ে দিতেও পারবে না? মীরার সুন্দর, ইচ্ছুক, স্বস্তিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুতেই বলতে পারলাম না, না। আমার অক্ষমতার কোথাও একটা সীমা থাক: আমি পুরুষ। কিন্তু পাই কোথায়? সোমবার—মাঝে চারদিন—পাই কোথায়?

৬ নবেম্বর

দেবীদাসকে টেলিফোন। 'বিশ্বরূপে' যদি।

ও-সব 'আসে' না? পুরুষ্টু অ্যাডভান্স পেলে এখন ঠিক আসবে। চাইবে কি দিতে? দেখা যাক না—বললো না আমার উপর ঝোঁক?

তিন বারের চেষ্টায় কনেকশন পেলাম।

'দেবীদাস?'

'সোমেন, কী-খবর?' (গলা নিস্তেজ।)

'সেদিন ঐ কলামটার কথা বলছিলে—'

'সে-তো হ'য়ে গেছে ভাই। ঈশ, মঙ্গলবারে বললে না!'

'ঠিক আছে, দেবীদাস!'

'বেণু ঘোষকে দিলো। শস্তা হ'লো, আর ছোকরা আজকাল লিখছে জোর—কী বলো?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো!' (কে বেণু ঘোষ?) 'আচ্ছা—'

'কিছু মনে করলে না তো?'

'কী-আশ্চর্য, এতে আবার...'

আপিশে প্রোগ্রামের ঠেলা, ছ-টার আগে বেরোতে পারি না। রাস্তায় ক্লান্ত, তবু ছিবড়ে শরীরটাকে টেনে আনলাম উজান বেয়ে পাব্লিশার-পাড়ায়। ট্রামে যেন আলো কম, পথ আর ফুরোয় না। দিনশেষের নিংড়োনো মানুষগুলির অসুস্থ, অপ্রকৃতিস্থ চেহারা ট্রামের তালে-তালে গায়ে-গায়ে হেলছে। আমি তাদের দেখছি, তারা আমাকে। না, কেউ কাউকে দেখছে না। এতলোক একসঙ্গে, অথচ সকলেই চুপ, চেতনাহীন, কেউ কাউকে চেনে না, কিন্তু প্রত্যেকেই অন্য প্রত্যেকের মতো। অনন্য কেউ নেই। কোমরে-কোমরে একদড়িতে বাঁধা কয়েদির দল যেমন না-চেনা না-বলা পরস্পরের একাত্ম।

(রোজ আপিশ থেকে বালিগঞ্জের ট্রামে উঠি, এ-রকম লাগে না। সব যেন ঠিক আছে, যেমন-যেমন হওয়া উচিত। কারো-কারো মুখ চিনি, কারো-কারো নামার জায়গাও জানি। আজ শ্যামবাজারের ট্রামে সবই অন্য রকম, অস্বাভাবিক। অভ্যাসের আরাম, অভ্যাসের জড়তা।)

বাড়ি ফিরতে আটটা বেজে গেলো। মীরা বললো কোথায়—? টাকার চেষ্টায়। হ'লো? হ'য়ে যাবে। (হালকা সুরে।)

পাব্লিশারদের কাছে কিছু হ'লো না। জানতাম, তবু গেলাম, বুঝি-হ'তোর মন-কামড় এড়াতে। কিন্তু পাই কোথায়? ধার।-কোথায়? আত্মীয়···বন্ধু···কিন্তু পাঁচশো যে অনেক টাকা, মানে আমাকে বিশ্বাস করার পক্ষে অনেক। আমার বাজারদর বড়ো জোর পঞ্চাশ। দশজনের কাছে পঞ্চাশ ক'রে···বাজে! বরং চড়া সুদে কোথাও—কোথায়?

উজ্জ্বল সহজ দুটো উপায় আছে। মীরার গয়না, আর মীরার

দাদা। কিন্তু দুটোই মীরার, আর এ নিয়ে শেষ কথা তো হ'য়েই গেছে। 'আমার এই সম্মানটুকু তুমি রাখো!' নিশ্চয়ই। আমি স্বামী, আমি বাধ্য। কিন্তু মীরাও স্ত্রী, তাই খেতে ব'সে বললাম আচ্ছা আপাতত কিছু সোনাটোনা বন্ধক রেখে, তারপর লাহিড়ী এলেই ছাড়িয়ে আনতে পারো?

তবে যে বললে হ'য়ে যাবে?

হ্যাঁ, মানে, খুবসম্ভব, তবে শেষপর্যন্ত—

শেষ পর্যন্ত হয়েই যাবে দ্যাখো না। (মিষ্টি হেসে।)

হ্যাঁ, হ'য়ে যাবে। হ'তেই হবে। এই তো মীরা এখন ঘুমোচ্ছে, আমি যদি আলমারি খুলে—কী বাজে! ঘুম পাচ্ছে, শুই।

মালতী সেনকে তিন দিন দেখি না।

৭ নবেম্বর

'জন্মান্তর' এ-ক'দিনে পাঁচ পৃষ্ঠা মাত্র লেখা হ'লো। খুদে-খুদে দৃশ্যে নাটকগোছের। চেষ্টা করি চটপট লিখতে, ছকমতো সাজাতে, পট্ট-পট্ট বসাতে, অর্থাৎ চেষ্টা বাদ দিতে চেষ্টা করি। নিজেকে জপাই এই-তো বাজে কাজ, এ নিয়ে কেন খেটে মরবে, এতেই-হবে ধ'রে নাও, তোমার টাকা নিয়ে কথা। কিন্তু পারি না। কিছুতেই পারি না প্রথম যে-কথা মনে এলো সেটাই বসাতে, পরীক্ষা না-ক'রে পারি না; না-ভেবে, না-খুঁজে, না-খুঁড়ে পারি না। তাছাড়া বইটার যত বার পাতা ওল্টাই দোষগুলির পিন ফোটে। তাতে আরো দেরি হয়।

নিজের কোনো পুরোনো বই পড়লে মনে হয় যেন পুরোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে কতকাল পর দেখা। তখন খুব প্রণয় ছিলো তার সঙ্গে, কিন্তু বহুদিন সে বিদেশে ছিলো, আমার জীবন থেকে লুপ্ত ছিলো, এখন

দেখা হ'য়ে অদ্ভুত লাগছে। মতে অনেকটাই মেলে না এখন, তাছাড়া তার উচ্চারণ কেমন কর্ণকটু, আর মাঝে-মাঝে এমন ভাষা বলে যা আমি কখনো বলি না। কিন্তু হাসলে তাকে তেমনি ভালো দেখায়, আর হঠাৎ কোনো কথায় ঠিক বুঝি যে তার আমার পছন্দ-অপছন্দ আসলে এক। অন্তরঙ্গ, তবু অচেনা। দেখা হ'য়ে খুশি, কিন্তু দু-দিন বাদে দূর বিদেশে ফিরবে ব'লে আক্ষেপ নেই।

লেখক তার নিজের দোষ নিজে যত বোঝে, শত্রু কোন সমালোচক তত? তার যৌবনে, মোটের উপর জীবদ্দশায়, ছিছিক্কারই বেশি জোটে, কিন্তু পনেরো বছর, পাঁচ বছর আগের, এমনকি এই সেদিনের লেখা কোনো বইয়ের পাতা ওল্টাতে হ'লে সে নিজেকে যা মনে-মনে বলে, তেমন নির্মম বোধবাক্য সমালোচনায় বিরল। বিরল সেই সমালোচক, যিনি ভুল দেখিয়ে শেখান, যাঁর নিন্দা, ঈষৎ পাংশুমুখে তা সত্য, কিন্তু সাবধানে পকেটে নিয়ে লেখক বাড়ি ফেরে। আর যে-সব অংশ, বাক্য, পংক্তি এখন তার লজ্জার বিছানা, যে-লোভে তখন মজেছিলো, যে-ফাঁদে পড়েছিলো, যে-কথা লিখেছিলো, কিংবা লেখেনি ব'লে এখন সে মরমে ম'রে আছে, সে-সব? সে-সব কেউ জানে না, আর-কেউ না। সেই তার নিজের কাছে লজ্জাকর কোনো অংশের প্রশংসাও হয়তো তাকে শুনতে হয়।

কোনো-একটা বইকে পাঠক যখন পায়, ঠিক তখনই লেখক তাকে হারায়। যতদিন লেখা হ'তে থাকে, তা-ই নিয়ে অবিরাম চিন্তা, রচনা আর বর্জন, তারই সঙ্গে খেতে বসা, তাকে নিয়েই ঘুমোনো, কষ্ট আশ্চর্য ইউরেকার মুহূর্ত। প্রুফ পেলে আবার উৎসাহ—যেহেতু ছাপার অক্ষরে উঠলে তবেই ঠিক বোঝা যায়—এবার ভাখো, আবার ভাবো, কাটো, বসাও—লেখায় প্রুফ দেখায় খাটুনি প্রায় সমান, শুধু শেষেরটার

রঙ বেশি। কিন্তু বই যেই বেরোলো, লোকের হাতে পৌঁছলো, অমনি লেখকের মন বুজলো। এখন এটা আর তার না, এটা নিয়ে তাকে আর খাটতে হচ্ছে না, পর হ'য়ে গেছে, তাছাড়া এখানে-ওখানে সন্দেহ জাগছে এর মধ্যেই। লেখকের সঙ্গে মা-র তুলনা ভুল, কেননা অপত্য সে ভালোবাসে না, প্রসবব্যথাটাই ভালোবাসে।

ব্যথা তীব্র, যেহেতু যেটা যখন অভ্যাস হ'লো তখনই সেটা ছেড়ে দেয়া তার অভ্যাস। যখন যেটা সহজে পারে, ইচ্ছা তার আরো উঁচুতে। তাই প্রত্যেকটি বই লেখকের নিজের কাছে অসফলতার আরো এক স্তম্ভ। তাছাড়া পৃথিবীতে অন্যের লেখা বই এত ভালো আছে, এত ভালো হচ্ছে যে সে-তুলনায় নিজেকে বাজে লাগবেই। মানুষটা এদিকে দাম্ভিক, অধার্মিক, শক্তির সীমা মানতে চায় না: অশান্ত, কেবল তার মাথা ফাটে, স্নায়ু ছেঁড়ে, পিঠ বেঁকে যায়। কিন্তু কেন? কেন এই অসম্ভব লড়াই?

৮ নবেম্বর

আজ শনিবার, মীরার পাঁচশো টাকার এখনো দেখা নেই। চেষ্টা 'যা পারি করলাম, কিন্তু তাতে শুধু তা-ই প্রমাণ হ'লো নিজের মনে যা প্রথম থেকেই জানতাম। হবে না, আমাকে দিয়ে হবে না।

কেন মীরাকে সাফ সে-কথা বলিনি? এখনো কেন বলি না? মীরা, শোনো, আমি পারলাম না কিছুতেই, তোমার দাদাকে বলো এখন চালিয়ে দিতে, আর তুমি বলতে না চাও আমি বলছি। বলবো? বলো তো কাল সকালেই—এই ক-দিন পরেই তো ফেরৎ দিতে পারবে। কেমন?

কথাটা মনে-মনে বার-বার আউরিয়ে তৈরি করি। নিজের মনও

হালকা লাগে। সত্যি, ভাবনা কী। অনর্থক দুশ্চিন্তা, ঘোরাঘুরিতে সময় নষ্ট। এখন উঠে-প'ড়ে আগে লাহিড়ীর কাজটা—ঠিক! শ্রীপতিবাবুর কাছে টাকা চাইবার অসম্মান? ও কিছু না, না-হয় একটু তোয়াজ ক'রেই কথা বলবো। আমি তৈরি। মীরা, কেমন?

এর পর সে রাজি না-হ'য়ে পারবে না।

বিকেলে চায়ের পরে বলবো ব'লে তাক ক'রে আছি, কিন্তু মীরাই আগে কথা পাড়লো।

দাদা আজ খবর পাঠিয়েছেন।

কী?

সোমবার থেকেই কাজ শুরু হবে।

তা—বেশ।

আমি ভাবছিলাম তুমি যদি দাদার কাছে একবার—

আমি যাবো? (সতর্ক)

দাদার জন্যই তো হ'লো এটা—তুমি যেন এর মধ্যে কিছুই না এ-ভাবটা না-ই বা দেখালে। একবার গেলে পারো।

বেশ তো। (এইবার!) তা শোনো একটা কথা—

আর টাকাটাও তুমিই তাঁকে দিয়ে এলে ভালো দেখায়। কাল তো রোববার—

(দ্রুত) আমি তোমাকে সে-কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। টাকা এখনো—

এখনো জোগাড় হয়নি জানি, কিন্তু কালকের মধ্যে তো হ'তেই হবে।

আগে যে বললে সোমবার?

হ্যাঁ, সোমবার হ'লেও মুখরক্ষা হয়। (শুকনো গলা)

(একটু চুপচাপ)

কী, হবে না ?

আমি মীরার মুখের দিকে তাকালাম। শক্ত মুখ, শক্ত চকচকে চোখ। ওর দোষ না। আমি ওকে আশা দিয়েছি, আমি ওকে কথা দিয়েছি।

নেহাৎ যদি তোমার অসুবিধে হয় তাহ'লে না-হয়—

মীরা অর্ধেক ব'লে থামলো।—সুযোগ! আমার মুখে এলো, ছাখো, সত্যি, কিছুতেই—কিন্তু তার চোখের ঠাণ্ডায় ঠোঁটের কথা জ'মে গেলো। চোখ বললো : এও পারলে না ? এত ক'রে বললাম, এও পারলে না তুমি!

—তাহ'লে না-হয় টাকাটাও আমি জোগাড় করি।

মীরার মুখে কুশ্রী রেখা আমি ফুটতে দিলাম না, তখনই বললাম—ভেবো না, আমি ঠিক এনে দেবো সোমবার।

আমি পুরুষ।

সেই মুহূর্ত আর ফিরবে না, আমার মূঢ়তা এখন পাথর হ'য়ে চেপে আছে। কী করবো সোমবারে ? জানি না। আমশির মতো মুখ ক'রে সেই-তো শেষমুহূর্তে কবুল ?

কিন্তু আর না! এখনো আস্ত একটা দিন পেরিয়ে তবে সোমবার। টাকার কথা এ-ক'দিনে অনেক ভেবেছি, অনেক বলেছি। কী নোংরামি!

কাল একবার মালতী সেনের কাছে।

৯ মহেশ্বর

আজও গেলাম না। মনে কেমন লজ্জা ঢুকেছে। ছায়ার মতো মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে সেই হাতে-ধরা নোটের বাণ্ডিল, সেই গলা-টেপা চীৎকার সূক্ষ্ম ছুরির মতো বিঁধে আছে। যার সামনে একবারও কাঁদতে হয়েছে, তাকে কি ক্ষমা করতে পারে কেউ ? সেদিন থেকে তার কাছে অপরাধী আমি। কিন্তু তাই তো আরো যাওয়া উচিত ; না-যাওয়াটাই

অপরাধের প্রমাণ। সে কি ভাবছে দয়া ক'রে চ'লে গেলাম? সে কি ভাবছে কোনোরকমে ওটা তার হাতে দিয়েই স'রে পড়েছি, দায় সেরে? তাতে তার আরো কত লজ্জা, আরো কত অপমান আমার!

তুচ্ছ টাকা! আমি যে তার কথা ভাবি, এ-কথা সে বোঝেনি এখনো? আমি যে তার জীবনের অংশ চাই এ-কথা বোঝেনি?

জীবনের অংশ? সোমেন, সাবধান। কী বলছো তার মানে বোঝো? অনেক হয়েছে, এবার পরদা টেনে দাও। তুমি কি তার সর্বনাশ করবে?

সর্বনাশ কেন? আমি যদি তার কাছে গেলে শান্তি পাই, সেটা কি খারাপ? আমাকে দেখলে সে যদি মনে আশা পায়, সেটা খারাপ?

কিন্তু আজও গেলাম না। সকালবেলা ঘুরে-ঘুরে শেষ দুরাশা ভেঙে এলাম। হয়তো একেবারে অসম্ভব নয় এমন তিনজনকে মনে পড়লো, কোনোকালের বন্ধুজন। একজন গেছে বিলেত বেড়াতে, আর-একজন বাড়ি তুলছে ব'লে টানাটানিতে আছে, আর অন্যজন আমাকে দেখে সত্যি এমন খুশি হ'লো যে ধারের কথা বলতে পারলাম না। থাক— আর-কিছু করার নেই। নিশ্চিন্ত।

এর পর রবিবারের সারাটা দিন লাহিড়ীর লেখা নিয়েই। অনিচ্ছার উজান ঠেলে কোনোরকমে তীর ছুঁলে বাঁচি। এখনো তার দেরি আছে, কিন্তু শেষ একদিন হবেই এ-কথা ভেবেই যা-একটু উৎসাহ। এক-এক সময় এত বিস্বাদ লাগে যে মন থেকে সেটা মুছে ফেলার জন্য—শুধুই সেজন্য—রাত্রে ঘুমের আগে এই খাতায় খানিকটা ক'রে লিখছি। কত মাস পরে বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চা আমার; বিক্রি হবে না, ছাপা হবে না, শুধু ইচ্ছে করে ব'লে। মনে কিছু কথা আছে, মনে-মনেই বলি।

'জন্মান্তরে' আমি কী বলতে চেয়েছিলাম? কথা, যে এই ভালোবাসা সত্য, এত বড়ো সত্য জীবনে আর নেই। কখনো সেটা অন্যায়ের মূর্তি নিয়ে আসে, সংসারে দুঃখ ছড়ায়, হয়তো তার জন্য মরতেও হয়। তবু সত্য, মহাসত্য, যদি কোনো ভগবান থাকেন তবু তাঁর নাম ভালোবাসা।

এ কেমন ভালোবাসা যা দুঃখ দেয়, ঘর ভাঙে, যাতে মরতে হয়? ভালোবাসা কি সেটাই নয়, যাতে মানুষ বাঁচে, যাতে তার কল্যাণ, তার শান্তি?

এ-প্রশ্ন কি তখন আমার মনে হয়েছিলো? মনে পড়ে না। এ-বই যখন লিখেছিলাম, চোদ্দ বছর আগের সেই কলকাতার শীত এখন জ্বরের স্মৃতির মতো ঝাপসা। যেন জ্বরের ঘোরে লিখেছিলাম, রাত জেগে, সারাদিন বাইরে ঘোরার পরে, কলকাতায় আমার প্রথম বাসা কালিঘাটের ব্যারাক-বাড়ির দোতলার শস্তা ঘরে। সামনে ছিলো পেট্রল-পাম্প, ট্যাক্সি-লরির আস্তানা, রাত দুটোর আগে ঘটর-ঘটর থামে না। আমি, আরো পরে। সেই আমার নতুন কলকাতার রাত্রি, রাত্রির সংকীর্ণ শুব্ধ প্রহর!

এই জ্বর আমি এখন ভুলে গেছি, ওতে আমার বিশ্বাসও ভেঙেছে। ওটা যদি ঠিক-ঠিক কাজ করে, তার মতো আর কিছুই হয় না জানি, কিন্তু সাক্ষাৎ স্বর্গের করুণা জীবনে মানুষ ক-বার পেতে পারে? বেশির ভাগই পথে বসায়, প্রতারক। এটা? কিছু হয়নি, শুধু যৌবনের উদ্দাম অশ্ববেগ ঝড়ের মতো পাতা উড়িয়ে ব'য়ে গেছে। যুবক ছিলাম, তখন যুবক ছিলাম।

কিছু হয়নি, আসল কথা বলা হয়নি। শুধু আছে বলার ইচ্ছা, তীব্র ইচ্ছা, আকুতি, কোনো-এক হৃদয়ের সত্যে আত্মহারা সমর্পণ। ঐটুকুই খাঁটি। এত ফেনার মধ্যে এটুকু সর এখনো ভাসমান।

এখন সম্ভব? যা বলতে চেয়েছি, চাই, আজও চাই, এখন বলা সম্ভব? এই সিনেমার ভাষাতেই? পরেশবাবুর হুকুম সব তামিল ক'রেও?

পাগল!

লা-আভ্ স্টোরি। মিলন-ফিলন কিছু একটা। শনিবার দেখবে, রবিবার বলবে, সোমবার ভুলবে। আমার কী? টাকা নিয়ে কথা। সবুর পরেশবাবু, এমন মেওয়া ফলাবো যে বাংলাদেশের বালগোপাল আহ্লাদে আটবার টিকিট কিনবে।

বাধা শুধু এই যে আমার জীবনে নানা ভাবে ব্যর্থ বছরগুলি আমার চেতনায় অবিরাম শান দিয়ে গেছে। তাই আমি অযোগ্য। কাজের, সুখের, বাঁচার অযোগ্য, সকলের সমতলে বাঁচার, তার মানে এই যুগের। যা-কিছু আমি করতে যাই, চেতনার শয়তান-হাত এড়াতে পারি না।

তুমি এখনো শোওনি?

দূর থেকে, কত দূর থেকে মীরার গলা ভেসে এলো। তাতে ঘুমের ভার, তাতে স্মৃতির ভার। এই 'জন্মান্তর' যখন বেরোলো, তার অল্প পরেই প্রথম দেখা হ'লো। আলাপ একটু ঘন হ'তে তাকে উপহার দিয়েছিলাম। পড়েছে কিনা জিগেস করিনি, ছাপার বই তখন বাজে হ'য়ে গেছে আমার কাছে, জ্যান্ত বই নিয়ে ব্যস্ত। শুধু পড়ার না, লেখারও বই।

কেমন নম্র হ'য়ে ঘুমুচ্ছে। টেবল-ল্যাম্পের নীল ছায়ায় বিছানা ঢেকে আছে, মুখ দেখছি না, সব কঠিন রেখা লুপ্ত, দিনের সব ময়লা শুষে নিয়েছে স্বপ্নের মতো ঘুম। ডাকবো? কিন্তু আমার ডাকে আবার কি সে জাগবে?

এখানেও আমার দোষ। আমি সুখ চেয়েছিলাম, সুখী করতে শিখিনি। আমারই দোষ।

১০

'আপিশ থেকে টাকা আনবে ?'

'আপিশে আর কোথায় পাবো।'

'তবে ?'

'সে আছে। পরে বলবো।' সোমেন মুখ টিপে হাসলো।

'তুমি আপিশ থেকে এলেই তাহ'লে—'

'হ্যাঁ, আমি এলেই তোমার দাদার কাছে যেয়ো। একটু দেরি হ'লো, না ?'

'ওতে কিছু হবে না। আজ ধুতি প'রেই যাচ্ছো ?'

'যাই।'

'আবার টাকা নিয়ে আসবে—সাবধান কিন্তু।'

'ঠিক !' সোমেন একটু ভাবলো, ভাবার ভাণ করলো। 'আচ্ছা সেই পোর্টফোলিওটা বরং নিয়ে যাই।'

সোমেনের প্রোফেসরির স্মৃতিচিহ্নটা অব্যবহারের ধুলো ঝেড়ে মীরা তার হাতে দিলো।

'দশটা টাকা দাও।'

'দশটা···?'

'দাও, একটু দরকার আছে।'

'টাকা কিন্তু আর—'

'ঐ তো ওর দোষ, একটু দাঁড়াতে ভালোবাসে না।' সোমেন বাঁকা ক'রে হাসলো।

'তাড়াতাড়ি ফিরো।'

'চেষ্টা করবো। চলি।'

ব্যাগ হাতে নিয়ে হালকা পায়ে সিঁড়ি নামলো। একবার শিস দিতেও চাইলো, কিন্তু একদম পারে না।

সোমেন যথারীতি দ্রুত হাঁটলো, ট্র্যামে উঠলো, নীরব গম্ভীর আপিশযাত্রায় মিশে গেলো, কিন্তু ট্র্যামটা এসপ্ল্যানেড ছেড়ে ড্যালহৌসির দিকে বেঁকবার আগেই নেমে পড়লো, এসপ্ল্যানেডেই নেমে পড়লো।

এখন তার শরীরে আর ব্যস্ততা নেই, চোখ থেকে কেজো ভাবের একরোখোমি ঝ'রে গেছে। অলস পায়ে চৌরঙ্গি পার হ'য়ে এলো এক টোব্যাকোনিস্টের দোকানে। আঃ—কী-ভালো গন্ধ।

'একটা টেলিফোন করতে পারি ?'

'করুন।'

সোমেন তার হাতঘড়িতে তাকালো। দশটা বাজতে পাঁচ। একটু যাক—ঠিক দশটায়। তার চোখ কাচের আলমারীতে ঘুরে-ঘুরে বেড়ালো। নামজাদা মার্কা সব আবার হাজির। নেবে এক টিন ? বাঃ, নিলেই তো হয়।

'ফাইভ-ফিফটিফাইভ কত ক'রে ?'

'চার টাকা চোদ্দ আনা।'

'দিন,' সোমেন দশটাকার নোট বের করলো।

'আর-কিছু ?'

'আর আপনাদের টেলিফোনের চার্জ।'

'করেছেন ?'

'এই করবো এবার।'

খুচরো দিয়েছে সব চকচকে, দোকানটা বেশ। কড় কড় শব্দটা কানে

দিয়ে চেখে-চেখে সোমেন টিন কাটলো, সিগারেট ধরিয়ে টেলিফোনের কাছে এলো।

'পদ্ম কেমিক্যালস।'

'ম্যানেজারবাবুকে দিন।'

কিচ্‌।

'হ্যালো।'

'নমস্কার মিস্টর সিনহা, আমি সোমেন দত্ত বলছি। আজ আমি আপিশে আসতে পারবো না, মিস্টর সিনহা।'

'বাড়িতে অসুখ?'

'ঠিক বাড়িতে না। আমাব এক আত্মীয়—রিফিউজী—দেখবার কেউ নেই—তাঁর একটা ব্যবস্থা না-ক'রে—'

'বুঝেছি। এই রিফিউজী এক ব্যাপার হয়েছে সত্যি! তা—খানিক বাদে আসতে পারেন না? বারোটায়? না-হয় টিফিনের পরে? এদিকে আপনাদের প্রোগ্রামের সময়—আর গাঙ্গুলি জানেন তো—'

'নিশ্চয়ই! খুব চেষ্টা করবো, মিস্টর সিনহা। যদি কোনোরকমেও পারি···আচ্ছা, থ্যাঙ্কিউ, মিস্টর সিনহা।'

বাইরে এসে নিশ্বাস ছাড়লো, বুক ভ'রে নিশ্বাস নিলো। আ—ঃ!

ঘুম থেকে ওঠামাত্র এটা তার মনে আজ ঝলকেছে, মনস্থির করতে মুহূর্ত লাগেনি। আজ সে ছুটি নেবে, প্রয়োজনের মুঠি থেকে খসবে, বোকা ঘটনার বাধ্য আর থাকবে না। একটা দিন, শুধু একটা ছোটো দিনের একটুখানি সময়! আজ সে কিছু করবে না, কিছু ভাববে না। তথা, অনতিক্রম্য মনিব, এটুকুতে তাঁর কোন ক্ষতি

হবে? কাল সব হবে, কাল থেকে আবার সব। মীরার কাছে ধরা পড়ার আগে এই একটা দিন, কয়েকটা ঘণ্টা।

এক হাতে সিগারেট, অন্য হাতে অনর্থক ব্যাগ ঝুলছে, সোমেন দাঁড়িয়ে থাকলো, তাকিয়ে থাকলো। সুন্দর দিন, কলকাতায় প্রথম শীতের স্নিগ্ধ লাবণ্যের দিন! মৃদু হাওয়া শীতল যেন তৃপ্ত প্রেমিকার শরীর, আকাশ উজ্জ্বল, নীল ঢালুর শান্তিভরা গড়নে এখনো একটু-একটু মেঘের ফেনা আঁকড়ে আছে। পুরীর সমুদ্র মনে পড়লো তার, সমুদ্রের নীল, ঢেউয়ের চূড়োয় শাদা ডানার দুরন্ত ঝলক। তারই একটি ঢেউ কি তার হাতের কাছে ছুঁড়ে দিলো সময়ের অতল অন্ধকার থেকে হঠাৎ এই আশ্চর্য উপহার, নিটোল নির্মল মুক্তো, এই দিন!

শুধু তাকে। অন্য সবাই কাজের টানে ছুটেছে, চেষ্টার কুটিল গলিতে, নিয়মের আরামের আশ্রয়ে, জীবিকার ছুতোয় কোনো-রকমে দিনটা কাটিয়ে দেবার সুখের প্রলোভনে। ট্র্যাম-বোঝাই, বাস-বোঝাই, কেউ হেঁটে, কেউ মসৃণ গাড়িতে, কিন্তু সকলেই নিশ্চিন্ত, বাঁচার দায়িত্ব ভুলতে পেরে নিশ্চিন্ত। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখলো সে, অবিরল ট্র্যাফিক, অবিরল বদ্ধপরিকর জনস্রোত, সোমবারের শোভাযাত্রা। আর এই সোমবারেরই উপর দিয়ে আস্তে উঠেছে ময়দানের প্রান্ত থেকে নীলিমা, সমস্ত কলকাতায় আভা ফেলে, তার স্বর্গীয় কারুকর্ম কেউ দেখলো না।

সোমেন আস্তে হেঁটে ফুটপাতের ছায়া থেকে বেরোলো। কর্পোরেশন স্ট্রীট পার হ'তে গিয়ে হঠাৎ যেন চেনা গলার ডাক শুনে থামলো। গন্ধ, পুরোনো বন্ধু তার, রাস্তা থেকে উঠলো তার দিকে, উঠলো রোদ্দুর থেকে অ্যান্ফল্টের সুবাস। ঐ গন্ধ, তাজা,

গরম, তীব্র, বিলীয়মান, ঐ তার যৌবন। এখনো তা বাসি হয়নি?

আবার ছায়া, ঠাণ্ডা; চৌরঙ্গির উঁচু-উঁচু বাড়ির পিঠে সকালের সূর্য আড়াল। কোথায় চলেছে? তার প্রথম প্রেম ফিরে পেতে, তার প্রেমিকা এই কলকাতার কানে-কানে আবার কিছু কথা বলতে? বাজে ভাবনা—শৌখিন ভাবুকতা! না, ভাববো না—সোমেন হঠাৎ একটু থামলো—খুলির মধ্যে সব সময় টিকটিক-আওয়াজ-করা ঐ যন্ত্রটাই আমার শত্রু। কল থামিয়ে দিলাম—আবার পা চললো তার—এসো এখন চারদিক থেকে পৃথিবীর চেতন অনুভূতি, এসো চোখে, কানে, নাকে, আমার শরীরের অসংখ্য ফুটোওলা চামড়ায়। আমি নিষ্ক্রিয়, আমি তোমাদের শূন্য পাত্র, এই মুক্ত মুহূর্তের পাখার হাওয়ায় তোমাদের যা ইচ্ছে সেখানে ঝ'রে পড়ুক।

আঃ—গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে এই গন্ধের বীথিকা, পুঞ্জ ছায়ায় নিরাপদ! জাহাজের, দ্বীপের, বিদেশের গন্ধ, টাটকা মোটা সরভাজার মতো বিলাসিতার আঘ্রাণ, আর ক্ষীণ, প্রচ্ছন্ন, কিন্তু নির্ভুল, মানুষের অদৃশ্য পরিশ্রমের তেতোমিঠে গন্ধ।

কারা চ'লে যাচ্ছে হোটেল থেকে, এয়ারওয়েজ-এর গাড়িতে মাল তুলছে। দেখা যাক। দৃপ্ত পায়ে বেরিয়ে এলো তিনজন—মার্কিন নিশ্চয়ই? যুদ্ধের মধ্যে ইংরেজ মার্কিন চিনতে শিখেছিলো—মার্কিনরা একটু মোটার দিকে, গায়ের রঙে দগদগে লাল ভাবটা কম, হাসিখুশি মসৃণ মুখচোখ। তারা খায় ভালো, অতীতের ভারেও পীড়িত না। তিনজনের সজীব মুখের উৎসুকতা লক্ষ্য করলো সোমেন, সর্বদা যেন এটার পরে ওটার দিকে উৎসুক। কোথায় যাচ্ছে এখন? ক-দিন ছিলো কলকাতায়? মনে তাদের কোন

ছবি নিয়ে গেলো এই দেশের? আর এই-যে তাদের কলকাতা ছাড়ার মুহূর্তে সেখানকার একজন মানুষ কেমন মন নিয়ে তাদের দেখলো—

না, জানলো না। আসল কথা কিছুই আমরা জানি না, শুধু অস্থির ছুটে চলি কোন কঠিন হাতের নিশ্চিত মৃদু আকর্ষণে। আমিও সেই হাতে এখন? না, আমি স্বাধীন। তুমি ভাবছো সোজা যাবো? এই দ্যাখো বাঁয়ের মোড়ে বেঁকলাম।

পথে-পথে ঘুরে বেড়ালো সোমেন, ভয়াল সমুদ্রের গা ঘেঁষে, তার স্বাধীনতার সংকীর্ণ সৈকতে প্রতিটি মুহূর্ত চেখে-চেখে। পথে দোকান, সিনেমা, সিনেমার ছবি, পেট্রল-মেশা ধুলোর গন্ধ, আর মানুষ, কত রকম মুখের মানুষ, দাঁত-উঁচু কুচ্ছিৎ মেয়েটা রিকশয় চলেছে—সে-ই বা কত খুশি! তারপর মার্কেটের অলিগলি, ঠাণ্ডা, অন্ধকার, দিনের এ-সময়ে ঈষৎ যেন তন্দ্রা-লাগা, কাচের বাটিতে লাল মাছের সূক্ষ্ম জেস্‌-বোনা দেখে-দেখে স্মৃতির মতো লাগে, প্রায় স্বপ্নের মতো। স'রে এসো—বরং বই ছাখো। কিন্তু বই কি আর আসে এ-দেশে! শুধু খবর, মত, ওকালতি, হয়তো স্বাস্থ্য, কামসূত্র, জীবনে উন্নতি করার 'বৈজ্ঞানিক' তুকতাক। যার লক্ষ্য জীব নয়, প্রজা নয়, শুধু মানুষ, পুরো জ্যান্ত মানুষটাই, তেমন বই—

সোমেন খপ ক'রে হাতে তুললো। রোগা বই, শস্তা, মহামূল্য! হলদে মলাটের দিকে একবার তাকিয়েই দাম দিয়ে স'রে এলো, সামনে গেলো ভিতরে দেখার প্রলোভন, কালো-কালো পংক্তির ফাঁকে অন্য এক শুভ্র পথে তখনই ধরা দিলো না। আবার রাস্তা, রোদ চড়েছে, দিন চলেছে আকাশের শিখরে, ভঙ্গুর কম্পমান দিন, এইমাত্র ঘড়ির ঘণ্টায় কম্পমান। ঢংং···ঢংং···ঢংং, বাজলো

মার্কেটের চুড়ো-ঘড়ি, হাওয়ার বিস্তীর্ণ প্রাসাদে কাচের ঢিল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে, দিনটাকে টেনে-টেনে লম্বা ক'রে দিয়ে, ঢংং, বাজলো সময়ের কাঁটা, দুঃখী মানুষের গলার কাঁটা, ঢংং, নিবৃত্তির গম্ভীর গলা নকল ক'রে বাজলো, ঢংংংংং, বেশ মিলিয়ে গেলো আ'পাশে, আবার আকাশ জুড়ে দিনের নিঃশব্দ পরিশ্রম শুধু থাকলো।

সোমবার, সোমেনের মনে পড়লো, এগারোটা বেলা।

কিন্তু হাঁটতে বেশ লাগছে, হাওয়ার ঠাণ্ডা আছে এখনো। চৌরঙ্গি ধ'রে পার্ক স্ট্রীটের মোড় অবধি। এই-তো—এখানে ভিড় কম, বাজার-পাড়া ছাড়িয়েছি। কুকুর নিয়ে শ্বেতাঙ্গিনী, চাপরাশি বেয়ারা, কখনো বা খানিকটা ফুটপাত জুড়ে আমিই শুধু। আর ফুটপাত কী পরিষ্কার, যাকে বলে চিক্কণ, আর কেমন অবহিত, আমার প্রত্যেকটি পায়ের শব্দ আমাকেই শোনাচ্ছে। ময়দানের গাছের ছায়াও মনোরম, কিন্তু সেখানে বেঞ্চিতে ব'সে যারা দুপুর কাটায়, তাদের কথা আগে কখনো ভাবিনি।

সোমেন, হাতে পোর্টফোলিও, তাতে রোগা একটি বই, সিগারেটের টিনে পকেট উঁচু, রোদ্দুরের ঢেউ ঠেলে দুলে-দুলে হাঁটলো। মনে হ'লো ঠাণ্ডা ছেড়ে গরমের দিকে এগোচ্ছে, ক্রমশ যেন ক্লান্তির দিকে। অসুবিধে এই যে শরীরটা জোচ্চোর—আর শুধু কি শরীর! মন নিয়ে এত-যে তোমাদের গরম, তারই বা কাজ ছাড়া গতি কোথায়? রোগের দুঃখ তো এই যে সময় কাটে না, জরার দুঃখ তো এই যে সময় কাটে না, আর তাই তো মৃত্যুর খিদে অন্ধ কিছুতেই মেটে না মানুষের। ক্ষুদ্র মানুষ, তার ক্ষুদ্র স্বাধীনতার স্বপ্ন। অসীম অসহ্য; বেড়া দাও, ঘিরে দাও, ভাস্বর নগ্নতা ঢেকে রাখো। স্বর্গ থেকে বিদায়, স্বর্গ থেকে পতন; কর্ম, বিরাট অবিরাম চাকার অফুরন্ত ঘূর্ণন।

এতক্ষণে পার্ক স্ট্রীট। এখন? কোথাও কোনো লাইব্রেরিতে—না, নিজেকে ফাঁকি দেবো না, এই দিনের ভার আমি সহ্য করবো, তার দায়িত্ব নেবো। চলো। তেতে-ওঠা রাস্তা পার হ'য়ে লোকেন ট্র্যাম-স্টপের কাছে এলো। কোনদিকে? যেটা আগে আসবে সেটাতেই উঠবো। ঐ আসছে শহরমুখো—শোঁওও! শিগগির—ওদিকে—আরে! চোখ নেই—আর-একটু হ'লেই গিয়েছিলে—হুশ্‌শ্‌। তার ঠিক পায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো বালিগঞ্জের নাম লেখা ট্র্যাম।

'আপনি গান করুন। আমি চ'লে যাই।'

'গান করছিলাম না—'

'আমি গানের মতোই শুনলাম।'

'মাঝে-মাঝে রেওয়াজ না-করলে—' ছিটকাপড়ে ঢাকা পড়লো তানপুরো। 'আপনি হঠাৎ এ-সময়ে?'

'এলাম। আসবো না ভেবেছিলাম, কিন্তু—' (মিথ্যুক! সকাল থেকে জানতে।)

'বসুন।'

'বসবো? ভেবে বলবেন, হয়তো ব'সেই থাকবো।'

তানপুরো দেয়ালের কোণে দাঁড়ালো।

'আপনি দুপুরে গানের রেওয়াজ করেন?'

'যখন সময় পাই একটু নিয়ে বসি। আপনি না-এলেও এখন থাকতাম।'

'আমি আজ আপিশে যাইনি। ইচ্ছে করলো না।'

'অন্য কাজে বেরিয়েছিলেন?'

'অমনি বেরিয়েছিলাম। একটু জল খাবো।'

হাফ-প্যান্ট-পরা অংশু তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এলো।

'লক্ষ্মী ছেলে !···চিঁড়িয়াখানা দেখেছো ?···ভাখোনি তো ? (আঃ, ঠাণ্ডা জলের মতো ভালো কিছু নেই।)

'মা বলেছেন একদিন নিয়ে যাবেন।'

'আমি নিজেই যেতে পারি,' ফন্তু আস্তে বললো। 'এই তো কালিঘাট —আর কালিঘাট গেলেই আলিপুরের ট্রাম !'

'আমিই বুঝি পারি না !' অংশু আড়চোখে সোমেনের দিকে তাকালো।

'তবে আর কথা কী। দু-জনে মিলে দেখে এসো একদিন। আজই তো যেতে পারো।'

দু-জোড়া বালক-চোখ একসঙ্গে মা-র দিকে ছুটলো।

'আজ যদি যাও আমিও যেতে পারি তোমাদের সঙ্গে। আমারও বেশ দেখা হ'য়ে যাবে কত কাল পরে !' (ভালো মনে পড়েছে ! বেশ সারাদিন কাটিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে সন্ধেবেলা—আর চিঁড়িয়াখানায় খালের ধারে বিকেলের ঘাস কী ঠাণ্ডা !)

'মা, যাবো ?' (কানে কানে) 'যাই, মা ?'

'আপনি দয়া ক'রে অনুমতিটা দিয়ে দিন।'

'আজ না, অংশু। ফন্তু, একটা কাজ করবি ?'

একটু মলিন হ'লো ফন্তুর মুখ।

'একবার যাদবপুরে তোর মিনু-মাসির খবরটা নিয়ে আসবি ?'

'পরশু তো গিয়েছিলাম, মা।'

'আজ আবার যা। অসুখ তো—মাঝে-মাঝে যেতে হয়। দুটো কমলালেবু কিনে নিয়ে যাস—আর শোন, আসবার সময় সের পাঁচেক

চাল নিয়ে আসিস একেবারে। আচ্ছা অংশুও যা, দু-জনে ভাগাভাগি ক'রে আনতে সুবিধে হবে। সাড়ে-দশ আনা সেরেরটা আনবি। এই নে।' কচিপাতা রঙের প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে মালতী বের ক'রে দিলো পাঁচটাকার নোট, কিছু খুচরো। 'দেখিস, আবার পয়সা হারিয়ে আসিস না সেদিনের মতো।'

'না, মা, হারাবো না।'

অংশু কাছে এসে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়ালো, মার কানে-কানে কী বললো।

'আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে···হ্যাঁ, বলবো।'

হাতে দুই বাজার-ব্যাগ ঝুলিয়ে দু-ভাই বেরিয়ে গেলো। আবাল-বৃদ্ধবনিতার হাতে ঐ ব্যাগ আজকাল। কারোটা বাহারে, কারোটা শাদাশিধে, কারোটা চিটচিটে নোংরা—কিন্তু সব খাদ্যান্বেষী। দুর্ভিক্ষের নিশান—সোমেন ভাবলো—আমাদের অবমাননার প্রতীক।

মালতী দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এই প্রথম সোজাসুজি সোমেনের দিকে তাকালো। শুকনো মুখ, ঠোঁট বিবর্ণ।

'আপনি এখনো খাননি?'

'আমার একটু বেলাই হয়। আপনি আজ এসে ভালো করলেন।'

'অংশু তখন কী বললো আপনার কানে-কানে?' (বাজে কথায় আশ্রয় নাও।)

'ঐ—চিড়িয়াখানার কথা—'

'ওদের নিয়ে যেতে চাইলাম—দিলেন না কেন?'

'শুনলেন তো সব।'

'আপনার বোন থাকেন যাদবপুরে?'

'থাকে একজন—মানে সেদিন এলো। রিফিউজী কলোনিতে থাকে।'

'আপনার কেমন বোন? আপন?'

'পিসতুতো বোন। বারো বছর পর দেখলাম।'

'অসুখ তার? কী-অসুখ?'

'সব কথাই শুনবেন?'

'যেটুকু বলবেন সেটুকুই শুনবো। আমি ভাবছিলাম অংশু ফন্তুকে এখনই পাঠাবার কি দরকার ছিলো?'

'ছিলো একটু। আপনার সঙ্গে কথা আছে আমার।'

চোখে চোখ পড়লো। হঠাৎ দু-জনেই যেন মনে-মনে থেমে গেলো।

'আপনি খেয়ে আসুন না।'

'শুনুন। আপনাকে একটা কাজের ভার দেবো।'

'কাজের ভার?' (কেমন সন্দেহ হচ্ছে?)

মালতী তক্তার পায়ের দিকে স'রে গেলো, ট্রাঙ্ক-বাক্সর উপর থেকে বালিশ ক-টা নামালো।

'ও-সব নামাবেন?'

'আমি পারবো।'

'আপনি পারেন জানি, রোজই ক'রে থাকেন, কিন্তু রোজ তো আর আমি থাকি না।'

মালতী একটু স'রে দাঁড়িয়ে বললো, 'আচ্ছা।'

(ঐ 'আচ্ছা'টা বললেন ব'লে আমি আপনার ঋণী থাকলাম।)

সোমেন ভাঁজ-করা তোশক নামালো।

'আর?'

'তলার ট্রাঙ্কটা একবার খুলবো।'

ছোটো আর বড়ো স্যুটকেস নামানো হ'লো। হাঁটু ভেঙে ব'সে রংচটা মস্ত ট্রাঙ্ক খুললো মালতী। ভিতর থেকে ন্যাপথলিনের স্মৃতি উঠলো, স্মৃতির কড়া গন্ধ, বন্ধ ঘরে একলা-জ্বলা ধূপদানির মতো ভালো-ভালো শাড়ির আর গরম জামার দম-আটকানো সৌরভ। বিয়ের বেনারসি, গৌতমের শাল, ঐ কাশ্মিরি বাক্সে হয়তো চিঠির গুচ্ছ—জীবন, মালতী সেনের হারানো জীবন। কিন্তু এই জীবন তো সকলকেই হারাতে হয় একদিন—অকালে মৃত্যু এসে যাদেরটা কেড়ে নেয়, তারা তবু প্রতিদিনের প্রতিকারহীন অবক্ষয়ের দুঃখ জানে না।

অন্যায় কথা। নিষ্ঠুর চিন্তা।

কুচকুচে কালো একটা বাক্স বের ক'রে মালতী ট্রাঙ্ক বন্ধ করলো। সোমেন আবার পর-পর সব তুলে রাখলো। একটু পরিশ্রম হ'লো এবার—সেটা লুকোবার জন্য মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো।

'এই বাক্সটা আপনি নিয়ে যাবেন?'

'আমি নিয়ে যাবো? কেন?'

মালতী বাক্সের ডালা তুললো। সোমেনের চোখে ঝলক দিলো সোনা, হলদে, উদ্ধত, নানান গড়নে প্যাঁচানো, পাকে-পাকে জড়ানো। যেন কোনো নির্লজ্জ দৃশ্যের সামনে থেকে পিউরে স'রে এলো।

'এটা আপনার কাছে রাখুন।'

কালো বাক্স হাতে ক'রে মালতীকে দাঁড়ানো দেখলো সোমেন, দেখলো তার চোখের স্থিরতা, ঠিক তার চোখ এড়িয়ে স্থির।

'আপনার হয়েছে কী?'

'কিছু তো হয়নি।'

'আপনি বলুন।'

'আমার এই কথাটা আপনি রাখবেন না?' শাদা ঠোঁট কাঁপলো।

'আপনি দয়া ক'রে খেয়ে আসুন ?'

'রাখবেন না আমার কথাটা ?'

'বসুন। শুনুন।'

ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলে মালতী ব'সে পড়লো।

'আমাকে আপনি এই ভাবলেন ?'

মালতী কথা বললো না।

'আমাকে আপনি এই ভাবলেন !'

'আপনাকে আমি কিছু ভাবিনি। আমারই দরকার।'

'কিছু দরকার না ! ও আপনি তুলে রাখুন।' (মীরার শেষ সম্বল, প্রত্যেক হিন্দু মেয়ের শেষ সম্বল।)

'এতদিন রেখেছিলাম কোনোরকমে, কিন্তু—আর হয় না। আপনি যদি—'

'না।'

'তাহ'লে আমিই কোথাও—'

'আপনি দয়া ক'রে খেয়ে আসবেন ?'

মালতী একটু নড়লো, আস্তে হাত রাখলো কালো বাক্সটির গায়ে। যেন আপন মনে বললো, 'বাবা আমাকে সাধ্যের বেশি দিয়েছিলেন। এতে আমার মা-রও কিছু আছে।' তার নরম গলা ঘরের স্তব্ধ দুপুরে ঝুলে থাকলো, কম-ভারি জিনিশ যেমন ডোবার আগে জলে একটু ভেসে থাকে। মা ! বাবা !—সোমেনের মনের উপর ভেসে গেলো—কত কাছের, তুচ্ছেতুচ্ছ, শ্যাওলা-পড়া পুকুরঘাটের পুরোনো গাছতলার মতো শৈশবের ছায়াচ্ছন্ন কত সুদূর কথা !

'তাঁরা কোথায় ?'

'বাবা ? মারা গেছেন। মা আছেন দাদার কাছে ভুমভুমায়।'

'ভুমডুমা ?'

'আসামে চায়ের বাগান। দাদা সেখানে ডাক্তার। তাঁর ছেলেপুলে অনেক, কষ্টে আছে। ছোটো এক বোনও আছে, তার এখনো বিয়ে হয়নি। ভেবেছিলাম—'

মধুর শুনছিলো সোমেন, নম্র বিষণ্ন গলা, ধীর, যেন অনিচ্ছুক, কোন হারিয়ে-ফেলা বসন্তের শেষ নিঃসঙ্গ ভ্রমর। কিন্তু হঠাৎ কেন সুর কাটলো ?

'কী বলছিলেন ?···আপনার বোন ? তার বিয়ে হয়নি ?···তা আপনার মা এসে আপনার কাছে—'

'ঢাকায় মাঝে-মাঝে এসে থাকতেন। কিন্তু ওখানেও তাঁকে ছাড়া তো চলে না। তাছাড়া—'

'বলুন।' সোমেনের উৎসুক হৃদয় তার দৃষ্টিতে স্তব্ধ হ'লো। একটু অপেক্ষা ক'রে আবার দরজায় টোকা দিলো, 'এখানে এসে আপনার কাছে থাকতে পারেন না তিনি ? আপনার মা-র কথা বলছি।'

কিন্তু না, দরজা বন্ধ হ'য়ে গেছে। অন্য একজনের জীবনের শরিক হওয়া এতই কি সোজা ? একসঙ্গে পঁচিশ বছর বাস করার পর স্বামী-স্ত্রী কতটুকু জানে পরস্পরের কথা ? বাপ কতটুকু চেনে তার যুবক ছেলেকে, মা তার কিশোরী মেয়েকে ? মানুষের সব কথা কেউ কি জানে, জানতে পারে ? কোনো-এক···কোনো-এক···আছে কি সত্যি ?

'আপনি তাহ'লে···?'

'না।' সোমেনের আবার চোখে পড়লো সোনা, উজ্জ্বল কুসুম চোখ, পিঙ্গল হাসির মুখব্যাদন। ডানা তুললো কখন ?

'আপনি বুঝছেন না। এখানে যে-ভাবে থাকি, অনেক সময় কেউ ঘরে থাকি না—পাড়ায় চুরিও হচ্ছে।'

সোমেন চেষ্টা করলো চোখ ফেরাতে, কিন্তু কামুক পুরুষ যেমন উলঙ্গ উন্মাদিনীর দিকে তাকায়, তেমনি তার চোখ সোনার নির্লজ্জ শরীরে ব্যভিচারী হ'লো।

'আমি ভাবছিলাম—কোনো ব্যাঙ্কে রেখে যদি—'

'আবার ব্যাঙ্ক!'

'—কি বিশ্বাসযোগ্য অন্য কোথাও—আমি তো ঠিক এখানে তেমন—'

বিশ্বাসের কথা কী বললো? সোমেন যেন ভালো ক'রে শুনতে পেলো না।

'এ-সব জমা রেখে কেউ টাকা দেয় না?'

মালতী উত্তরের আশায় চোখ তুললো। কিন্তু সোমেন তাকে দেখলো না, তার চোখ আটকে আছে আঠার মতো সোনায়। সে কি পারে? সে কি পারে না?...'মীরা, এই নাও টাকা!'... পথ খুলে গেলো তার সামনে, দীপ্ত, প্যাঁচালো, লাল; বিষাক্ত লাল ফুলের মতো মোহন ফণা তুললো, হিংস্র সোনালি জন্তুর মতো লাফিয়ে নামলো তার গলায়।

সোমেন হঠাৎ চোখ বুজে ফেললো।

'আচ্ছা। আপনার অসুবিধে হ'লে থাক।'

আঃ, মুক্তি! শান্তি!...কিন্তু সোমেনের কৃতজ্ঞ চোখ মালতীকে দেখলো না, দেখলো মীরাকে, তার সুশ্রী মুখ, তার ঠোঁটের বিলোল হাসির মতো লোলুপ পথরেখা।

'আপনি ব্যাঙ্কে—ব্যাঙ্কে জমা রাখতে চান?' (কী বিশ্রী মোটা গলা! আমি বললাম?)

'নয় তো বেচে দিলেও হয়। ও-সব তো আর লাগবে না আমার, আপাতত টাকাটাই—'

'টাকা আপনার এখনই চাই ?' (কী কষ্ট কথা বলতে !)

'এখনই মানে—মানে—আমার বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছে। কিন্তু টাকা ঠিক জোগাড় হচ্ছে না। এদিকে এই অভ্রানের মধ্যেই— আমি তাই ভাবছিলাম ওই থেকে—'

'ব্যাঙ্কে টাকা পেতে কিন্তু দেরি হয়।' (ওঃ, দম আটকে ম'রে যাবো !) 'সাত দিন—দশ দিন—'

'তা হোক। বিয়ের দিন কুড়ি দেরি আছে এখনো।'

(ততদিনে পরেশ ? নিশ্চয়ই ! আমি ঘামছি ?)

'তাহ'লে…'

হঠাৎ সোমেনের আঁটো বুক হালকা হ'লো, অ্যাসপিরিন খেয়ে জ্বর ছাড়ার মতো আরাম কুলকুল ক'রে পিঠে নামলো। আবার সে স্পষ্ট সব দেখলো, স্ববশে ফিরে পেলো হাত-পায়ের সঞ্চালন। কী আশ্চর্য পথ, দেখতে ভয়াল, কিন্তু স্পর্শে কত নরম, মেঘনার মসৃণ সোনালি বালুর মতো কেমন আদর ক'রে পা টেনে নেয় !

'আপনার কাজ আমি ক'রে দেবো, কিন্তু—' ঠোঁটের কোণে হাসি টানতে গিয়ে সোমেনের মুখের পেশী কাঁপলো, কাঁদবার আগে যেমন হয় তেমনি বেঁকলো তার অসহায় ঠোঁট, আর গলায় আওয়াজ বেরোলো যেন দুর্বলের হীন আবেদন :

'—কিন্তু আপনি কি আর-একবার ভেবে দেখবেন না ?'

খুট ক'রে বাক্সের বন্ধ হ'লো ডালা। আর উপায় নেই।

* * * *

'শোনো মঞ্জুলা, এই রইলো ময়লা কাপড়ের বস্তা।' সন্ধেবেলা

ধোবা এলে দিয়ে দিয়ো। আমি তখন বাড়ি থাকবো না। সব লেখা আছে—ঠিক আছে। রুমাল নিয়ে সতেরোখানা। আর শোনো—বাপ্টি বুলবুল স্কুল থেকে এলে ওদের খাবার দিয়ো। আমাকে যেন না ডাকে। আমি এখন ঘুমুবো।'

ঘরে এসে মীরা অবাক।—'কখন এলে ?'

'এই—।'

'এত শিগগির ?'

'চ'লে এলাম।'

'আপিশ ছুটি হ'য়ে গেলো ?'

'ভালো লাগলো না।'

'কী ? শরীর খারাপ হয়েছে ? এসেই শুয়ে পড়লে ?'

'এমনি। শরীর খারাপ হয়নি। বেশি কাজ ছিলো না আপিশে ; চ'লে এলাম।'

এর পরের প্রশ্নটি মীরার চোখে ফুটলো।

সোমেন বললো, 'তোমার টাকা এনেছি। পোর্টফোলিওতে আছে।'

নোটের তোড়ার সঙ্গে আরো দু-একটা জিনিশ বেরোলো।

'এই কাগজটা কিসের—এই যে বি এস নন্দী অ্যাণ্ড সন্স ?'

সোমেন অর্ধেক মাথা তুললো।

'ও কিছু না—আপিশের। দাও। বইটাও দাও।'

সোমেন কাগজটা ভাঁজ ক'রে পকেটে রাখলো, হলদে রোগা কবিতার বইটা এতক্ষণে খুললো।

'কোথায় পেলে টাকা ?'

'ধার করলাম।'

'কোত্থেকে বলো তো?'

সোমেন কথাটা শুনতে পেলো না। বই খুলতেই কবিতা তাকে কামড়ে দিয়েছে।

Grain of musk lying invisibly

In the depths of my eternity!

আর পড়লো না, তন্দ্রার মতো আনন্দ নামলো মনে। সব ভুলে গেলো: এতক্ষণ কী ক'রে এলো, এর পর আরো কী করতে হবে, সব মুছে গেলো মন থেকে, কানে যেন গান শুনলো, দূর থেকে ভেসে-আসা অন্ত গান, তেমন জীবনে কিছু শোনেনি, কিন্তু যত গান জীবনে শুনেছে সবই ওর মধ্যে মেলানো। এও আছে, এও তবে আমার!

'...আমি তাহ'লে একটু সকাল-সকালই—তুমিও চলো না—আগে চলো জমিটা দেখবে—দাদা ততক্ষণে আপিশ থেকে—' ও মা, ঘুমিয়ে পড়লো! এই না কথা বলছিলো?

মীরা কাছে এসে ঘুমন্ত স্বামীর কপালে হাত রাখলো। অসুখ করেনি তো?

১১

১১ নবেম্বর

কিছুই হয়নি, কিছুই হ'লো না, সব ঠিক তেমনি আছে। আকাশ টুকরো হ'য়ে ভাঙেনি, কুঁকড়ে থেমে যায়নি হাওয়া, শীতের জলে মিষ্টি তার একটু কমেনি। আমি হাঁটছি, খাটছি, ঠাট্টা ক'রে জবাব দিচ্ছি শীরার কথায়, বাপ্তিকে আদর করছি।...তাহ'লে এত সহজ?

এত সহজ। কিন্তু এখন ভেবে অবাক লাগছে কেমন ক'রে পেরেছিলাম। যেন বিশ্বাস হচ্ছে না, যেন মনে হচ্ছে ওটা কোনো স্বপ্ন...দুঃস্বপ্ন।—বাজে! বাস্তবে বাঁচো, বর্তমানকে মেনে নাও। সোমেন দত্ত, কবি, ভাবুক, অক্ষম—অক্ষম তুমি আর নও; অন্যেরা যা পারে তুমিও তা-ই পারো, অন্য অনেকেই যা পারে না তাও তুমি পেরেছো; আমার তো ভক্তি হচ্ছে তোমার উপর, রীতিমতো। নিজের যোগ্যতা তুমি জানো না, তাই এতদিন কষ্ট পেলে; এবার হাতে-হাতে প্রমাণ পেয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

তাছাড়া—হয়েছে কী? ক-দিন পরেই তো পরেশ, যার টাকা তৎক্ষণাৎ ফেরৎ; আর সেও তো বেচে দিতেই চায় বললো না? তার কাছে আপাতত একটু সাহায্য নিলে, এই তো ব্যাপার? সে জানলো না অবশ্য, কিন্তু যদি জানতো, জানতো যে তোমার কোনো কাজে সে লাগলো, তাহ'লে—তা'হলে কি—

চুপ। যা নিয়ে মানুষ পরস্পরকে কামড়ে ছিঁড়ে মাতাল, সেই

সোনা, টাকা, মাটি, ধুলো, পাঁক—তার প্রকট ক্লেদ আরো চাও তো আমার উপর চাপাও, কিন্তু হৃদয়ের নোংরামি না, হৃদয়ের নরম, গোপন, অকথ্য নোংরামি না।

ঐ তো! বিবেক নিয়ে ধুকপুক-বুকে বাঁচবে? ফুটপাতে পোকার মতো মাড়িয়ে যাবে যে সবাই। কিছু ভেবো না—সব ঠিক আছে। মীরা খুশি, মালতী সেনের কোনো ক্ষতি নেই, আর তুমি যদি নিজেই নিজের মন খুঁড়ে-খুঁড়ে কষ্ট না পাও, তাহ'লে তোমারই বা ভাবনা কিসের।

থাক না, একটু কষ্ট অন্তত থাক। ওটুকুই আমার প্রমাণ।

বি এস নন্দীর দোকানে ঢুকেছিলাম যেহেতু সেটাই কাছেই পড়লো—দেরি করলে হয়তো আর পারবোই না—আর ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে কোনো খদ্দের ছিলো না ব'লে। হ্যাংলা লিকলিকে ছোকরা দোকানি, ছোট্ট শাদা পুতুল-মতো মাকুন্দো মুখ, মুখের ভাবটা সরল নিষ্পাপ এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ বখাটে, ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবির উপর জহর-কোট গায়ে—আমি, বেলা তখন একটা, রাসবিহারী এভিনিউতে হট্টগোল কম, ফুটপাতে রিকশওলা ছাতু খাচ্ছে, উল্টো দিকের দোতলার বারান্দায় এক মহিলা চুল এলিয়ে বেগনি শাড়িতে ছবির মতো দাঁড়িয়ে—আমি এই ছোট্ট মুখের লিকলিকে ছোকরার সম্মুখীন হলাম।

আসুন, আসুন। (হাসিমুখে, কত যেন চেনা।)

আপনারা কি—

হ্যাঁ, বলুন।

মানে—আপনারা কি সোনা কেনেন, বা—

(একটু মুখের দিকে তাকিয়ে) আপনি ভিতরে আসুন।

ঠিক তখনই এক মহিলার প্রবেশ। প্রবেশ নয় তো যেন দিগ্বিজয়ী

পদক্ষেপ। বলিষ্ঠ চেহারা, পূর্ণবয়স্ক, খাটো কোঁকড়ানো চুল, মুখে নিবিড় রাসায়নিক প্রলেপ, ঠোঁট দুটো টকটকে যেন মা-কালীর জিভ। কথা যখন বললেন প্রায় পুরুষের গলায়।

কিসমৎ কানবালা আছে?

(কিসমৎ? ফিল্ম?)

লাল নীল মখমলের বাক্স একে-একে খোলা হ'লো সামনে। ইনি একে-একে পরলেন, খুললেন—দেয়ালে ঝোলানো আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে হাসলেন নড়লেন হাঁটলেন, এ ক-এক বার বেচারা আমার একদম গা ঘেঁষে—সেখানে যে মনুষ্যজাতীয় আরো কেউ উপস্থিত, সে-বিষয়ে ঈর্ষাযোগ্যরূপে নির্বিকার আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম, অপেক্ষা করলাম, দেখলাম। দেখলাম কাউন্টারের কাচের উপর থরে-থরে সোনা সাজানো; সোনা, হলদে, লাল, উজ্জ্বল, প্যাচালো, হিংস্র ফুল, ক্রূর চোখ, দুরন্ত দয়াহীন ক্ষমতা, পৃথিবীর সর্বেশ্বর, মানুষের নিয়ন্তা। মহিলাটিকেও দেখলাম। কাচের উপর ছায়া-পড়া মোটা-মোটা ডবল আঙুল, হাত-কাটা জামায় গোল পৃথুল মাংসল বাহুর ওঠা-নামা, চলতে গেলেই বিরাট স্তনে ঠোকাঠুকি, আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে প্রশংসাপরায়ণ স্মিত হাস্য—সমস্তটা মিলিয়ে ঐ সোনার মতোই নিশ্চেতন, নির্লজ্জ, শরীরের সর্বস্বতায় উপস্থিত।

দারুণ লোভ হ'লো আমার। কাঁধের উপর যেখানে কিসমিসের মতো তিল, সেখানে ছোট্ট চিমটি কাটি যদি? কিংবা, ধরো, হঠাৎ যদি ঘুরে দাঁড়িয়ে আস্তে নাকের ডগাটি একবার ম'লে দিই? কিছু না; তাতে আমারও কোনো বীরত্বের প্রমাণ নেই, মহিলাটিরও আসলে কিছু এসে যায় না;—কিন্তু তাতেই হৈ-চৈ, হুলুস্থুল, ভিড়,

চ্যাচামেচি, হয়তো প্রহার, হয়তো পুলিশ পর্যন্ত। কত উপায়, কত সহজ উপায় আছে এখনো আমার মুক্তির! পারি না?…কিংবা, এমনি, এখনই, কিছু না-ব'লে হঠাৎ যদি কেটে পড়ি? বাধা দেবার কেউ নেই, জবাবদিহির কিছু না, জোর একটু অবাক হবে ছোকরা। ঐ তো দরজা, ঐ তো ফুটপাতে রিকশওলা গাছের ছায়ায় ছাতু মাখছে। যাই?

'নাঃ! পছন্দ হ'লো না।' মহিলাটি হঠাৎ মনস্থির ক'রে ঘুরে দাঁড়ালেন। দোকানিকে কথা বলার আর ফুরশৎই দিলেন না, বপুর পক্ষে বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতায় গটগট বেরিয়ে গেলেন। আমি মনে-মনে তাঁর নিষ্কৃতার তারিফ না-ক'রে পারলাম না।

আবার নির্লোম যুবকের মুখোমুখি। আমার মুখে হয়তো একটু অনভিপ্রেত দরদী ভাব ফুটেছিলো, তাই লাল নীল বাক্সগুলি সূক্ষ্ম আঙুলে তুলতে-তুলতে সে ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসলো।

'এ-সব আমাদের অভ্যেস আছে। এঁদের নিয়েই তো আমাদের—আপনি আসুন।' (ঠেলা দরজা টেনে ধরলো)

(গয়নার, শাড়ি-জামার দোকানে যারা কাজ করে, সেই সব দুর্ভাগা পুরুষদের কথা ভাবি। দিনের পর দিন তাদের স্ত্রীলোক—শুধু স্ত্রীলোক। আর সেই অর্ধেক মানবী অর্ধেক কল্পনাকে কী অবস্থায় দেখতে পায় তারা? সবচেয়ে অপ্রীতিকর, এমনকি অপ্রকাশ্য অবস্থায়। ভ্যানিটির তাপে যখন লাবণ্য উবে গেছে, মন যখন সব চিন্তা ছেড়ে শুধু শরীরটায় মগ্ন, চোখে যখন লোভের ধার, ঈর্ষার ধার, তুচ্ছ প্রতিযোগিতার চকচকানি। কেমন লাগে সেই পুরুষদের? না কি স'য়ে যায়, কিছুই লাগে না?)

এর পর আরো কি বলবো? ওজন, হিশেব, প্রশ্নোত্তর? কিন্তু কেনই বা লিখছি এ-সব। কালো চামড়ায় বাঁধানো এই খাতাটায়

কথা ছিলো কবিতা লিখবো। তা কবিতাও একরকম কনফেশন—একটু ঘোরালো, অন্যেরা ধরতে পারে না।

সব ঠিকঠাক ক'রে ছোকরা একটা ছাপা কাগজ বের করলো। আপনার সই চাই। আমাদের নিয়ম-মতো অবশ্য আপনার স্ত্রীরও সই দরকার—

আমার স্ত্রীর ?

মানে আইনত তিনিই তো এ-সবের মালিক—তা আপনি নিজে যখন এসেছেন, তখন আর কথা কী।

(এমনভাবে বললো যেন আমাকে চেনে। চেনে ? বাড়ির বস্তু কাছে—যাঁরা আসে-টাসে ? বেপাড়ায় গেলেই পারতাম—বৌবাজার, বড়োবাজার—)

তাহ'লে আসুন। (কলম এগিয়ে দিলো)

একটু পেঁচিয়ে সই করলাম, যেন অন্য কেউ সেজে।

ঠিকানা—

তাও দিতে হ'লো। হালকা ফিনফিনে পাঁচখানা একশো টাকার নোট, উপরন্তু আবার কিছু খুচরো।

এই আপনার ডুপ্লিকেট—এই যে—কাটা দরজা টেনে ধরলো।

বেরিয়ে এসে চেনা পথ যেন অচেনা লাগলো। রিকশওলাটা ঢকঢক এক লোটা জল খেয়ে উঠে দাঁড়ালো। আমি কি তখন তাকে ঈর্ষা করলাম ?

এ-সব কালকের কথা, কিন্তু মনে হয় কত দিন, কত যুগ আগেকার। যে-আমি 'আমি' ছিলাম, তাকে কোথায় ফেলে এলাম, কত দূরে। এখনকার আমিকে কিছুতেই আর ছাড়াতে পারবো না।

১২ অন্ধেরা

শীতের সন্ধ্যায় শহরটা যেন সরীসৃপ। প্রকাণ্ড, হাত নেই, পা নেই, শুধু হাজার মুখে গিলছে আর উগরোচ্ছে, আর হেঁচড়ে পেঁচিয়ে টেনে-টেনে চলেছে অন্তহীন, ধোঁয়ার, কুয়াশার, ছায়ামূর্তির জঙ্গলে। সব অস্পষ্ট, যেন কিছুরই ভালো ক'রে এখনো সৃষ্টি হয়নি, তারা নেই, আকাশটারও তৈরি হ'তে দেরি আছে।

আপিশফেরৎ ট্র্যামের দিকে ছুটছে সব। কোথায় চলেছো, এত তাড়া? বাড়ি? সেখানে কি সুখ আছে, স্বচ্ছতা আছে, আছে হৃদয়ের পরিচ্ছন্ন উচ্চারণ? পারবে না পালাতে, গলিতেই থাকবে। যেখান থেকে ছুটছো ফিরবে সেখানেই। তুমি প্রকৃতির যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী নও। তোমার স্ত্রীকে তুমি ভালোবাসো, প্রকৃতি তার নিজের কাজ করিয়ে নেয়। তোমার জীবনের অংশ কেড়ে নেয় তোমার সন্তান, আর সেই জীবনকে রক্ত দিয়ে তুমি লালন করো। তোমাকে দিয়ে আসল কাজ হাশিল হ'লেই দাঁত নড়বে, চোখ ঝাপসা, কোমরে বাত, বিস্বাদ জিভ। স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় এখন তুমি বরবাদ, তবু আঁকড়ে ধুঁকে-ধুঁকে প'ড়ে থাকবে কে জানে কত কাল। কোথায় তুমি স্বাধীন, কোথায় তোমার ইচ্ছায় কিছু করো, কোথায় তোমার নিজস্ব কোনো মূল্য?

(সুখের বিষয়, কেউ ভাবে না, ভাবতে দেয় না। সেটাই মহত্তম চাতুরী।)

সোমবারের কামাইটা গাঙ্গুলি অবশ্য সুনজরে ছাখেননি, ছ-টা সাড়ে-ছটা অবধি খেশারৎ দিচ্ছি তার। একদিকে গাঙ্গুলির দারুণ তাড়া, আর-একদিকে এটা না সেটা, ওটা আবার করুন, ও-রকম না-হ'য়ে এ-রকম হ'লে কেমন হয়—এই সব কর্তৃপক্ষোচিত বিবিধ ফোঁপরদালালিতে নিজেই দেরি করিয়ে দিচ্ছে। তাতে আমার আপত্তি

ছিলো না, যদি-না আবার 'জন্মান্তরে'র 'জন্মান্তরসাধনের তাড়া থাকতো। রাত জেগে-জেগে লিখছি—সেটা বরং ভালোই লাগছে—অনেকদিন পর গভীর রাত্রির সঙ্গে আমি মুখোমুখি একলা। দিনটাকে সকলের সঙ্গে সমান বাঁটোয়ারায় নিতে হয়—ছিটেফোঁটাই পাতে পড়ে—কিন্তু রাত জাগতে পারলে মনে হয় যেন আমারই সম্পত্তি—সম্পদ। (এটাও কি দুর্বলের সান্ত্বনার উপায় ?)

আজ পাতা উল্টিয়ে দেখছিলাম, মন্দ এগোয়নি। এমনিও মন্দ না, লাহিড়ীর মনে ধরবে মনে হয়। শর্করাঘটিত লেহ্য পদার্থ, যাদের দাঁত ওঠেনি অসুবিধে হবে না। গানও দিতে হবে—নিশ্চয়ই—ভাবছি যদি মালতী সেনকে প্লে-ব্যাকের জন্য—বলবো ? কেন বলবো না ? কিন্তু ইচ্ছে করে না, কাউকে কিছু বলতে যেন মন সরে না—কিছু আমার একলার থাক।

একবার যাওয়া উচিত তার কাছে। উচিত ? যা করেছো তার পরেও ? তবে কি চোরের মতো স'রে পড়বো ? না, এতদিন যদি-বা ছিলো, এখন আর পালাবার পথ নেই।

লেখাটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করা চাই। যে-কোনোদিন হঠাৎ হয়তো পরেশবাবু হাঁক দেবেন। তাছাড়া হাত থেকে এটা একবার নামাতে পারলে—

ভাগ্য আমার, বোদলেয়ারের বইটা সেদিন পেয়েছিলাম। পড়বো, সে-আনন্দ সইবে না এখন, শুধু কাছে থাক, এক-আধবার উঁকি দিয়ে দেখবো। কবিতা, অমৃত, বিশল্যকরণী, এ কি সত্য যে আমারও মনে তুমি জন্মেছো ?

আর-একটু দেরি করো, আর-একটু সময় দাও আমাকে।

১৩ নবেম্বর

হঠাৎ ঘরে ঢুকে অপ্রস্তুত। লেপ গায়ে শুয়ে, পাশে একজন বর্ষীয়সী ব'সে। আমাকে দেখামাত্র ব্যস্ত হ'য়ে তিনি উঠলেন, মাথায় কাপড় টেনে কী একটু ব'লেই প্রস্থান।

।যে-সব কথা তৈরি ক'রে এসেছিলাম সব ভুলে গেলাম।

'শুয়ে?'

'এই—শরীরটা—'

'অসুখ?' কে যেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিলো তার শিয়রে, আমার হাত নামিয়ে দিলো তার কপালে। একটু সংকুচিত হ'লো, স'রে এসে মুখের দিকে তাকালাম। লালচে গাল, চোখ ছলছলে। ভালো দেখালো, বেশি সজীব, অসুখ বেশ আবেগের নকল করে।

'আপনার তো জ্বর হয়েছে!'

'এই একটু—। আপনি বসুন।'

আমি দাঁড়িয়েই থাকলাম।

অংশু ঘরে এসে মা-র হাতে হোমিওপ্যাথি শিশি দিলো। 'মাসিমা পাঠিয়ে দিলেন। এক্ষুনি খাবে একবার, আর-একবার দশটার সময়।' একটু থেমে, আমার দিকে লাজুক একটু তাকিয়ে: 'আমি যাই, মা? উপরে ওরা ব্যাগাটেল খেলছে। কিছু লাগবে তোমার?'

'না রে।—আচ্ছা, এক গ্লাশ জল রেখে যাও এখানে—'

'তুমি যাও, অংশু। আমি দেখছি সব।'

টেনে আনলাম কল্যর পড়ার টেবিল—যেহেতু ঘরে আর অন্য নেই—রাখলাম জলের গ্লাশ প্লেট দিয়ে ঢেকে। 'এখন খাবেন জল?'

'আপনি—আপনি বসুন।' (মানে—আপনি কেন এ-সব? আপনি কে? কিন্তু আমি শুনেও শুনলাম না।)

'বসছি। মাসিমার নয়, ভমিকাতেই সারবে?'

'সারবে নিজে-নিজেই। উনি পাঠিয়েছেন—খেলে তো দোষ নেই।'

'দোতলার বুঝি?'

'এঁরাই বাড়িওলা। ভদ্রমহিলা ভারি ভালো।'

'খুব। একটা ঘরের ভাড়া চল্লিশ টাকা নিচ্ছেন!'

'ইনি তার কী করবেন। ইনি খোঁজ-খবর নেন; অসুখ শুনে দু-বার এলেন আজ—ছেলেদের খাওয়ার ব্যবস্থাও—'

'আপনি কিছু খেয়েছেন? টেম্পারেচার নিয়েছেন? কবে হ'লো জ্বর?'

'জ্বর কিছু না। সেরে যাবে।'

'সেরে যাবে নিশ্চয়ই, কিন্তু ডাক্তার দেখাবেন কি?'

'ডাক্তার দিয়ে কী হবে?' (প্রায় হাসির সুরে।)

'অন্তত একবার—'

'কিছু লাগবে না।'

না, কিছু লাগবে না। আর যদি-বা লাগে তো ছেলেরা আছে, দোতলার দয়ালু ভদ্রমহিলা আছেন। আমাকে দিয়ে দরকার নেই।

সেই সব এলোমেলো প্রশ্ন, অসহিষ্ণু উচ্চারণ, আর অদ্ভুত প্রতিধ্বনি এখন যেন নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছি। যেন আমারই গলায় আমাকে ঠাট্টা করছে কেউ। যে-ব্যগ্রতা তাতে ছিলো, যে-উৎকণ্ঠা, এখন বুঝছি সেটা কত অশোভন—অর্থহীন। অর্থহীন? না।

অশোভন নিশ্চয়ই—প্রথম থেকেই তা-ই—অসংগত, হয়তো অন্যায়—কিন্তু অর্থহীন না, আমার কাছে মহামূল্য।

রাত অনেক হ'লো, তিনটে প্রায় বাজে। সব চুপ;—মনে হয় কলকাতাও যেন স্তব্ধ হ'তে জানে, যেন মানুষের ভাগ্যেও শান্তি আছে কোথাও। কিন্তু না;—এই স্তব্ধতার অন্তরালেও ধমনীর দুরন্ত কর্দম অবিরল প্রবহমাণ। ঘরে-ঘরে এখন ঘুম, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন, কোথাও আনন্দের কোথাও আতঙ্কের অনিদ্রা, কোথাও বা বুক-ফাটা অব্যক্ত চীৎকার। আর সেই পাঁচ-কোণা ঘরটায়? খোলা চোখ অন্ধকারে তাকিয়ে আছে?···কত কান্নায়, কত আলিঙ্গনে ভরা এই রাত্রি!

সোমেন পড়া শেষ ক'রে কলম হাতে নিলো:—

১৬ নবেম্বর

এ-ক'দিন একটু বেশি ব্যস্ত ছিলাম। জ্বর বাড়লো;—তার কথা শুনে আমি ডাক্তার ডাকবো না তাও কি হয়? ডাক্তারের উপর আমার রাগ হয় তক্ষুনি সারাতে পারে না ব'লে, নিজের উপর রাগ হয় সব সময় কাছে থাকতে পারি না ব'লে। কতটুকু সময়? সন্ধ্যা বড়ো ছোটো হ'য়ে গেছে আমার;—এই তো এলাম, বেরিয়ে দেখি রীতিমতো রাত।

আজ রবিবার, অনেকটা সময়। তবু এখনই ভাবছি কাল আবার কখন। কেন, কিসের আকর্ষণে? কথা না, হাসি না, সুখের এতটুকু হাওয়া সেখানে বয় না। চুপ ক'রে শুয়ে থাকে, চোখ বুজে, কখনো জল খেতে মাথা তোলে, দু-একটা কথা হয়তো এক-আধবার। কিন্তু এ-ই তো অনেক, এর বেশি আর কী চাই আমার, আরো কি চাই আমার? যখন পাশ ফিরে থাকে, তখনো তো চুলের তলায় গালের বাঁকা

রেখাটুকু দেখতে পাই। আর-কিছু না; আর-কিছু মনে হয় যেন বড্ড বেশি; শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি কাটাতে পারি।

* * *

আস্তে হাত পড়লো সোমেনের মাথায়। চমকে মুখ তুলে চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকলো। টেবল ল্যাম্পের আলোর তলায় ধবল কাগজের উজ্জ্বলতার পরে আধো-ছায়ায় মধুর দেখালো মীরার ঘুম-ভাঙা মুখ।

'তোমার ঘুম পায় না?'

'এই শুই।' কালো খাতাটা সরিয়ে রাখলো সোমেন, 'জন্মান্তরে'র লেখাটা কাছে টানলো।

'ভারি কষ্ট—এই শীতের রাত্রে জেগে-জেগে লেখা!'

'কিছু না। আমার ভালোই লাগে।'

'তার মানে, আমাকে বুঝি আর—'

'তোমারই জন্য তো লিখছি এটা।'

'আমার জন্য? তাও তো একবার গান্ধীগ্রাম দেখতে গেলে না। আজ রোববার গেলো—এত ক'রে বললাম—'

'একেবারে তৈরি বাড়িই দেখবো।'

'অদ্ভুত মানুষ তুমি! একটু বেড়াতেও তো ইচ্ছে করে মানুষের!'

'কত কাজ দেখছো তো।'

'কাজ সবাই করে, তাব'লে কি অন্য কিছু করে না? অন্তত দাদার কাছে একবার—'

'যাওয়া উচিত?'

'অন্তত ভালো দেখায়।'

'আচ্ছা, যাবো।'

'তাহ'লে কালই—কেমন? আপিশ থেকে ফিরে আবার যাও কোথায় রোজ?'

'সেই তো আর-এক মুশকিল হয়েছে।'

'কী?'

সোমেন একটু দেরি ক'রে জবাব দিলো।

'গাঙ্গুলির বাড়িতে যেতে হচ্ছে রোজ।'

'আপিশের পরে আবার বাড়িতে?'

'আর বলো কেন? নিত্য নতুন প্ল্যান আসছে ওঁর মাথায়—যাকে বলে কর্মবীর।'

'তা একরকম ভালো। সকলকে তো আর বাড়িতে ডাকে না।'

'হ্যাঁ, কর্তা বোধহয় প্রসন্ন হয়েছেন আমার উপর,' সোমেন হাসলো। 'দেখি—ইনক্রীমেণ্টটা যদি—তোমার শীত করছে, শোও।'

'তুমি?'

'আমি একটু পরে—কেমন?' টেবিলে-রাখা মীরার হাতে সোমেন একটু চাপ দিলো।

'বড্ড খাটুনি পড়েছে, সত্যি!...আমি শুই?'

মীরা শোবার পর সোমেন কালো খাতাটি আবার খুললো; একটু আগে যা লিখেছে প'ড়ে শিউরে উঠলো। এটা কেন? এটা কেন হ'তে গেলো? আর যা-ই হোক, আর যা-ই হবার হোক, এটা কি না-হ'য়েই পারতো না?

১২

চায়ের সঙ্গে নিমকি, বৌদির সঙ্গে মশকরা, কিছু সাংসারিক প্রসঙ্গ, দেশের অবস্থা বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রাজ্ঞ কথোপকথন, তারপর পানেব বদলে একটি লবঙ্গ মুখে দিয়ে সোমেন উঠলো।

মীরা বললো, 'তুমি যাচ্ছো?'

'যাই এখন। আবার তো—'

'কোথায় যাচ্ছো, বাবা?' বান্টি এগিযে এলো।

'আপিশ যাচ্ছি।'

'রাত্তিরে বুঝি আপিশ থাকে! আমি যাবো, বাবা, তোমাব সঙ্গে!'

'আর-একদিন—কেমন?'

'রোজ বলো আর-একদিন—নিয়ে আর যাও না।'

'বাবা এখন কাজে যাচ্ছেন, বান্টি—ছেড়ে দাও। তোমার ফিরতে দেরি হবে?'

'তা একটু হ'তে পারে। দেখছো তো রোজ।'

'যাচ্ছো তা'হলে?' শ্রীপতিবাবু মোটা শরীরে উঠলেন। 'ঐ গান্ধীগ্রামের কথাটা বলছিলাম। ভালো হবে, খুব রেসপেক্টেবল কলোনি হবে। নেক্সট উইক-এ দু-জন মিনিস্টার আসছেন দেখতে।'

'তাহ'লে আর কথা কী।'

'আর সিনেমার বই লিখছো শুনলাম? বেশ, বেশ। আজকাল আমি তো দেখছি বই-ফই কেউ পড়েই না, ঐ ফিল্মেই যা হোক—'

'হ্যাঃ, সিনেমাই ভালো!' মিহি গলায় জুড়লেন বৌদি। 'মোটা-মোটা বই দেড় ঘণ্টায় হ'য়ে যায়। কত সময় বাঁচে!'

'তা বিজনেস-এর দিকটায় চোখ রাখছো তো? কী বলে বীরেশের ভাই? পরেশটা একটু পাগলাটে-মতো, কিন্তু তালে ঠিক—কাজের ছেলে।' কথা বলতে-বলতে সিঁড়ির মাথায় এসে শ্রীপতিবাবু দাঁড়ালেন। টাকার কথা উঠলে অনেকেরই যেমন হয়, তেমনি খুব গম্ভীর মুখে গম্ভীর গলায় বললেন, 'দেবে কত?'

সংখ্যাটা বলতে হ'লো সোমেনকে।

'হুঁ?' শ্রীপতিবাবুর চোখ দুটি একটু ছোটো হ'লো। 'গুড সাম! কোয়াইট এ লার্জ অ্যামাউন্ট! ফিল্মের গল্প দু-শো পাঁচ শোতেও বিকোয় শুনি। তা—ঠিক তো? অল পাক্কা?'

হঠাৎ একটু শিউরে উঠলো সোমেন।

'কথাটা হচ্ছে কোনো ঝামেলা রেখো না। তোমার তো এ-লাইনে এক্সপীরিয়েন্স নেই, না-হয় আমি একবার বীরেশকে···কিছু না, নো ট্রাবল অ্যাট অল! খুব চিনি ওদের, কোনো দরকার হয় তো বোলো।'

'নিশ্চয়ই!'

ধাপে-ধাপে পারিবারিক ফোটোগ্রাফ পার হ'য়ে সোমেন সিঁড়ি নামলো, নিচে হ্যাটস্ট্যাণ্ডের গোল আয়নায় ক্ষণিক ছায়া পড়লো তার, তারপর রাস্তায় এসে হঠাৎ দেখলো আকাশে চাঁদ। কিন্তু চাঁদ দেখতে দাঁড়ালো না, তাড়াতাড়ি বাস্ ধরলো।

* * *

কাঁকুলিয়ার গলি থেকে বেরিয়ে তখনই সে বাড়ি ফিরলো না। এখন একা, একটু একা থাকতে চাই। গড়েহাটে যেখানে বাস্

দাঁড়ায় সেই নোংরা অংশটা তাড়াতাড়ি পার হ'য়ে সাদার্ন এভিনিউর শান্ত বিস্তারে পৌঁছলো। সুন্দর রাত্রি হঠাৎ। শীত কম, প্রায় ফাল্গুনের মতো হাওয়া, আকাশ জ্যোছনায় নরম। দলে-দলে লোক কেন বেরোয়নি আজ, এই যেখানে এখনো কিছু ঘাস আছে, গাছের সারি, চোখের দৃষ্টি, যেখানে পৃথিবী তার অফুরন্ত বইয়ের একটি ছোটো পাতা অম্লান খুলে রেখেছে?···কাজ? শুধু বেঁচে থাকাই কি আমাদের কাজ, বেঁচে আছি সেটা অনুভব করাও কি নয়?

হাঁটতে ভালো লাগছে, বাঁচতে ভালো লাগছে। 'ভালো লাগছে!' কত সহজ, সাধারণ, আবার কত বিরল, দুঃসাধ্য কথা!

—আজ ভালো আছি। জ্বর নেই।

বিছানায় ব'সে চুল আঁচড়াচ্ছিলো। একবার উঠলো, একটু পরে আবার এসে শুয়ে পড়লো। দুর্বল;—কিন্তু ছিপছিপেও দেখাচ্ছে, একটু ছোটো; তার মুখে নতুন লাবণ্য আজ দেখলাম।

সুন্দরী নয়; কোনো অর্থেই দেখতে কিছু ভালো না। কিন্তু আমার চোখে সুন্দর। গভীর তার চোখ, মায়াবী তার চুল, তার ঠোঁটের অস্ফুট হাসির তুলনা নেই। সবাই যা দ্যাখে আমিও তাই দেখি; আমি যা দেখি আর-কেউ তা দ্যাখে না। কী এই রহস্য? কিসের এই শক্তি যা আমাকে এই দিব্য চোখ দিলো? তারই নাম ভালোবাসা। তা হ'লে এই সুন্দর কি অলীক, প্রতিভাস, মতিভ্রম? শুধু আমাতেই এর অস্তিত্ব আছে, বাইরের বাস্তবে নেই? ···তা-ই বা কেমন ক'রে বলি। একজনের চোখে যে সুন্দর হ'লো, আর-একজনের চোখেও তার সুন্দর হবার বাধা কী? তার নিজেরই মধ্যে কিছু আছে, কোনো স্থায়ী অথচ সাধারণত অদৃশ্য বিকিরণ,

কোনো অন্যের সৌন্দর্যের উৎস, শুধু ভালোবাসার দৃষ্টিতেই যা ধরা পড়ে। কেউ নেই তা থেকে যে বঞ্চিত, কেউ নেই যাকে সুন্দর দেখা অসম্ভব।

(মানুষের আত্মা আছে, এ-ই হয়তো প্রমাণ।)

—আপনার সেই কাজ আমি করেছি। কিন্তু আমাকে এ-ভার না দিলেই পারতেন।

—খুব অসুবিধে হ'লো ?

মনে হ'লো সব তাকে বলি। সে কি বুঝবে না? শুধু একবার চোখ তুলেই আমার অপরাধ মুছে নেবে না?—না, অমুচ্চার্য। এ-ভার আমার একলারই বইবার। পারবো বইতে, কিন্তু আমার হৃদয়ের পোকা-পড়া কালিমায় যে-আলো এখন জ্বলছে, তার নিবে যাওয়া সইবে না।

—অসুবিধে আপনারই হবে। ব্যাঙ্কে দেরি হয়।

—আমার তো এখনই দরকার নেই।

—দরকার হ'লে বলবেন।

—আপনাকে কিছু বলতে তো হয় না।

সোমেন লেকের দিকে ফিরলো। কত কাল পরে এলো! কোনোদিনই বেশি আসেনি:—কেমন বিতৃষ্ণা, সবাই যায় ব'লে। কিন্তু—ভালো তো, সত্যি জায়গাটা ভালো। রাত একটু বেশি হয়েছে, লোক কম; শূন্য ঝিলিমিলি পথ হঠাৎ বেঁকে চোখ থেকে হারালো। মনে হচ্ছে নতুন কোনো সুন্দর শহরে অনেক রাত্রে এই প্রথম পৌঁছলাম।

—আমি এখন যাই। আজ আপনি শিগগির ঘুমিয়ে পড়ুন।

—এখনো আমার ঘুম পায়নি।

রাস্তা ছেড়ে ঘাসে উঠলো সোমেন, জুতোর তলায় সুখের মতো লাগলো। আদিম ঘাস, পৃথিবীর প্রথমতম, ইতিহাসের অতীত। মানুষ সৃষ্টি করলো ইতিহাস, প্রথম যেদিন জঙ্গল কেটে পথ বানালো, সেদিন। তারপর থেকে স্বস্তি আর ফুয়োয় না, পথের চিহ্ন আর মোছে না। খালি বেঞ্চিতে চিনেবাদামের খোশা, ঘাসের উপর ছিঁড়ে-ফেলা খাম। বেশ অন্ধকার তো, একটু বসি এখানে।

জলের ধারে কম-আলোর বেঞ্চিতে রাত্রি আরো স্ফুট হ'লো। অপুষ্ট চাঁদ পশ্চিমে আসীন, তার নীল ফিকে আভায় প্রায় অর্ধেক আকাশে অল্প তারা মিটমিট ক'রে জ্বলছে। কিন্তু সেই স্বচ্ছ নগ্নতা যেখানে পৌঁছয় না, পূবের সেই গভীরতর ঢালু ক্রমশ ঘন-নীল, কোমল, প্রায় কালো; সেখানে পুঞ্জ তারা উজ্জ্বল, তলোয়ার-ঝোলা কালপুরুষ বিরাট অবজ্ঞায় চাঁদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে।

ছাখো, নিশ্বাস নাও, জীবনের স্পন্দন শোনো।

মনে পড়লো অন্য জীবন, ছেলেবেলা, যৌবনের উড়ে-চলা দিন। কিন্তু তখনকার নিজেকে ভেবে ঈর্ষা হ'লো না, মনস্তাপ কিছু না, স্মৃতির পদ্মে একটি আর কাঁটা নেই। অসহ্য অতীত, যদি-না আমরা নিরন্তর নতুন হ'তে পারি, নতুনের জন্ম দিতে পারি। বোধহয় চৈত্র মাস, চাঁদের রাত্রি, যমুনার মাঠে দল বেঁধে হৈ-হৈ, অনেক হাসিগল্পের পরে একটুক্ষণ সবাই চুপ। হঠাৎ একজন ব'লে উঠলো, 'কেউ কি তোমরা বুঝতে পারছো যে আজকের মতো রাত্রি জীবনে আর খুব বেশি ফিরে পাবে না?' শুনে যারা তখন হেসেছিলো, আজ কি তাদের ভুল ভেঙেছে?—কিন্তু কই, হারায়নি তো, এই তো আমি ফিরে পেলাম।

—দোতলার ওঁরা জিগেস করছিলেন উনি কে। আমি বললাম, আত্মীয়।

—আত্মীয় কেন ?

—তাছাড়া আর-কিছু বলা যেতো না।

—আত্মীয়ই বুঝি একমাত্র অধিকারী ?

—অন্তত লোকচক্ষে তা-ই।

লোকচক্ষু! বেনামি, বিশাল, দূরবিস্তীর্ণ, জানলায় ফুটপাতে পরদার পিছনে কোথায় না তার উকিঝুঁকি! কিন্তু এখানে, অন্তত এই তরল সৌম্যতার বিস্তারে কোনো লুক্কায়িত লোকচক্ষু নেই। কেমন চুপ ক'রে ছড়িয়ে আছে, কালো, আরো-কালো গাছের ছায়া বুকে নিয়ে, ল্যাম্পপোস্টের লালচে ছায়ায় মাঝে-মাঝে লম্বা হ'য়ে বেঁধা, চাঁদের আলোয় কোথাও একটু চিকচিকে, কোথাও প্রায় ঘুমের মতো অদৃশ্য। এই লেকের জল অদ্ভুত কিন্তু—অস্বাভাবিক—এতটা তার আয়তন অথচ স্রোত নেই, স্তব্ধ; শুধু আয়নায় দেখা বিপরীত পৃথিবীর ইন্দ্রজাল।

—অংশু ফন্তুও মনে-মনে কী ভাবে জানি না।

—আপনি আমাকে কী করতে বলেন ?

—আমি কিছু বলি না। আপনি ভেবে দেখবেন।

যদি একটু শব্দ হ'তো, পাড়ে ছুঁয়ে একবার বলতো চঞ্চল! জল, চিন্তার সহচর, তোমার কেন গতি নেই ? বলো তুমি, মৃত্তিকার শিশু তোমরা, তোমরা যা খুশি করো আমার তাতে কিছু না। আমি সহজ, আমার কোনো বাধা নেই, আমি শুধু ঘুরে-ঘুরে ব'য়ে যাই, দূর থেকে দূরে; তোমাদের যত পচা, ছেঁড়া, উচ্ছিষ্ট জঞ্জাল, সব এসে আমাতে মেশে; আর তোমাদের যত অসম্ভব ইচ্ছা তারও

আমি নিষ্কলুষ আধার—আমি, লক্ষ্মীর জন্মপীঠ, আফ্রোদিতের মাতা।

—আমি যদি চ'লে যাই তাহ'লে কি আপনার ভালো হবে?

—আপনি আমার জন্য যা করলেন কখনো ভুলবো না।

—অর্থাৎ, আমাকে বিদায় দিচ্ছেন?

কত লোক এই জলের গান শুনলো! দস্যু, দুরন্ত নাবিক, অজানা পৃথিবীর কৌমার্যহর বীর;—দুঃসাহস, উলঙ্গ লোভ, মৃত্যু নিয়ে খেলা, কত স্বপ্নের স্বপ্নাতীত উদ্‌যাপন! আর যাদের স্বপ্নের খোশা খুলে-খুলে কোথাও কোনো শাঁস বেরোলো না—শূন্য—কিছু নেই—তাদেরও আছে লণ্ডনে টেমস, প্যারিসে সীন, কলকাতায় এই বালিগঞ্জের লেক।

নতুন হাওড়া পুল থেকে লাফ দেয় না কেউ? রকমারি হ'তো।

জলে ডুবলে মানুষ নাকি ফুলে ওঠে, বিশ্রী দেখায়, মাছেরা নাক-চোখ ঠুকরে নেয়। দেখিনি কাউকে। সেই একবার শুধু ফণী বর্মনকে দেখেছিলাম। ইকনমিক্স-এর সেরা ছাত্র, এদিকে কবিতা-খ্যাপা মানুষ, ইংরিজি বাংলায় ভালো কবিতা সব তার জিভের ডগায়। চাল-চলনে খাপছাড়া;—দাড়ি রেখেছিলো, রোগা, পিঠ কুঁজো, তীক্ষ্ণ নাকে চকচকে চোখে মেফিস্টোফীলিয়ান মূর্তিবিশেষ। বদনাম ছিলো নানা রকম; তার খাটের তলায় নাকি সন্দেহজনক বোতল থাকে, বন্ধ ঘরে একলা ব'সে কথা বলে, অনেক রাত্রে হস্টেলের ছাদে উঠে হ্যামলেটের স্বগতোক্তি আওড়ায়। একদিন—তার এম-এ পরীক্ষার বছর সেবার—একদিন সকাল থেকে তার দরজা বন্ধ, ভিতরেও নিঃসাড়। শেষটায় কাটা দেয়াল টপকে ঢুকলো ঢ্যাঙা সন্তোষ—চেঁচিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো। ...পরির মতো নকশা এঁকে মোমবাতি গলেছে টেবিলে। চায়ের পেয়ালায় আগের দিনের তলানি, বিস্কুটের গুঁড়ো। একটা বইয়ের

পাতা খোলা ; অদ্ভুত লেগেছিলো সে-বইটা চেম্বর্স ডিকশনারি। আর, একটা চ্যাপ্টামতো শিশি, তাতে হলদে রঙের মিছরির মতো দানা, অর্ধেক প্রায় খালি। হাত-পা মুড়ে কাৎ হ'য়ে শুয়ে আছে, শীত করলে মানুষ যেমন শোয়, যেন প্রায় ঘুমিয়েই আছে হঠাৎ মনে হয়। দেখতে তেমন খারাপ হয়নি, শুধু মুখটা কালো হ'য়ে গেছে—নীল।

'আমি এখন মৃত্যুর জন্য তৈরি, এমন মুহূর্ত আর আমি পাবো না। কবে সে আমাকে জোর ক'রে নিয়ে যাবে সে-জন্য ব'সে না-থেকে আমি স্বেচ্ছায় তার কাছে গেলাম।'

টুকরো চিঠি পাওয়া গেলো বালিশের তলায়।

বোকা—পাগল—কাপুরুষ—সব অর্থহীন। কেন—কোন মেয়ের সঙ্গে—সত্যি?—ইজন্য?—এ-সব কথাও ফেলে দাও। যেমন আমরা অন্ধকার কাকে বলে তা কখনো জানি না, একটু-না-একটু আলোর ছোঁওয়া থাকেই—হয় তারার আভা, নয় গলির গ্যাস, নয় দূর কোনো বারান্দার মিটমিটে লণ্ঠন—তেমনি আমরা হতাশারও অর্থ জানি না, আশার তারতম্য শুধু জানি। সেই হতাশা, অন্ধকার, যদি মুহূর্তেরও জন্য কেউ দেখতে পায়, তাহ'লেও কিছু তার হাতে থাকে; কর্মের চাকায় মাছির মতো আটকে না-থেকে নিজের হাতেই ঘুরিয়ে দিতে পারে একবার···শেষ বার।

কিন্তু কী অপচয়, জীবনের প্রতি কী অসৌজন্য!

সেই ফণী বর্মনের জন্য সোমেনের নতুন ক'রে কষ্ট হ'লো। শীতের মধ্যে হঠাৎ এই বসন্তের রাত্রি—তারও কি অংশ ছিলো না এতে? হয়তো এই জটিল সংসারে সেও কোথাও আলো জালতো আজ, আশা জানতো এমন কোনো ঘরে, যেখানে কথা বলতে ঠোঁট কাঁপে, মুখ ফিরিয়ে নেয়।

—আমি তো আর-কিছু ভাবি না—কেমন ক'রে অংশু ফস্তুকে মানুষ করবো। তাদেরই জন্য আমি বেঁচে আছি।

—আমাকেও তা ভাবতে দিতে আপনার আপত্তি?

—ভালো হবে না, আমি জানি তাতে ভালো হবে না।

কী আনন্দ, এই ভয়ের উচ্চারণেই সব কথা বলা হ'লো। কী তুমি জানো আর না জানো তাতে কিছু এসে যায় না, মালতী সেন; আমাকে তুমি ছাড়াতে আর পারবে না। তোমার দুঃখে আমি তোমার পাশে থাকবো, তোমার যুদ্ধে আমি তোমার সহায়, দিনের শ্রান্তির পরে রাত্রে শুয়ে-শুয়ে আমাকেই তুমি ভাববে। আমি তোমার দায়িত্বে জড়ালাম, তাই তুমিও আমার;—আমাকে তুমি ছাড়াতে আর পারবে না।

ধ্বনি—প্রতিধ্বনি তুলে ট্রেন চ'লে গেলো ওপারে। শোনো মনে-মনে শব্দ—কানাকানি—কথার চলাফেরা, ছন্দের পাখা-মেলা কম্পন। শোনো, মালতী সেন, তুমিও শোনো, কান পাতো এই রাত্রে, ঘুমিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তের নির্জনতায়—যা তুমি বলেছিলে, ব'লেও যা বলোনি, আর না-ব'লেও যত কথা বলেছিলে—সব কি এখন শুনতে পাও না?

—আর কথা না। আপনি ক্লান্ত, এখন ঘুমোন।

—আপনি বুঝবেন না আমাব কথা?

—সব বুঝেছি। ঘুমোন, কোনো ভয় নেই। আমি থাকতে আপনার কোনো ভয় নেই।

হঠাৎ সোমেন কেঁপে উঠলো। শীত? রাত হ'লো, চাঁদের মুখে লালচে রং ধরলো প্রায়। উঠি এবার।…কিন্তু, কিছু না, কিছুই কোনো সমস্যা নয় আর; ঘুঘুডাঙা, পরেশবাবু, বি এস নন্দী, সব ঠিক আছে।

চলো। সব করবে সে, সব পারবে ; সারা দিন আপিশের পর রাত জেগে সিনেমা লিখে রোজগার ; আবার তারই ফাঁকে, যেমন ইটের ফাটলে ফুল, তেমনি এই নতুন যে তার বুকের দুয়ারে কাঁপছে, বলছে খোলো, ভাঙো, হ'তে দাও, জন্মাতে দাও।

শক্তির চেতনা, অদ্ভুত, ইন্দ্রিয়ের বোধের মত তার শরীরে ছড়ালো। কোথায় ছিলো এতদিন, এই উৎস, তারই মধ্যে লুকিয়ে? একে না-জেনে কত লাঞ্ছনা, নিজেকে অপমান পদে-পদে। ভেবেছিলো ফুরিয়ে গেছে, ম'রে গেছে, কিছু আর হবে না তাকে দিয়ে···আর আজ তার বয়স যেন ক'মে গেলো, কালের ভার হালকা ; —আর ভয়-দেখানো অভিনয়ের পরে এই-তো আবার আলো, তথ্য অবিকল, স্পর্শের পুষ্টিকর উপস্থিতি। দ্রুত হাঁটলো সোমেন, রাত্রির নিবিড়তায় একলা, তাকে ঘিরে ঘাসের বিশ্বস্ত পরামর্শ, মাটির তলাকার অন্ধকার থেকে গাছের পাতায় ঠেলে-ওঠা উৎসাহের সঞ্চার ;—আবার তাকে ঘিরেই হাওয়ায় উড়িয়ে-নেয়া ধুলো, শাশ্বত ধুলো, পৃথিবীর কত কালের ফণী বর্মনদের অবলুপ্ত অক্ষৌহিণী স্মৃতি।

১৩

বাড়ির কাছাকাছি এসে তবে সোমেন বুঝলো রাত বড়ো কম হয়নি। রাস্তা নিরিবিলি, পানের দোকানে ঘড়িতে প্রায় এগারো। ফ্ল্যাটের সিঁড়িতে দশটার পরে আলো থাকে না, অন্ধকারে আস্তে উঠে তেতলায় ছোট্ট টোকা দিলো।

ঘুমো চোখে দরজা খুলে দিলো রতন।

নিঃশব্দ ফ্ল্যাট, অন্ধকার ঘর। আলো জেলে হঠাৎ কেমন নতুন লাগলো ঘরটিকে, যেন অচেনা, যেমন হয় প্রবাস থেকে বাড়ী ফিরে। কিন্তু মনোরম, আরাম দিয়ে পরিচ্ছন্ন আঁকা, গার্হস্থ্যের চিক্কণ ফ্রেমে বাঁধাই করা। যুগলশয্যা নিভাঁজ তৈরি, শূন্য, অপেক্ষমান, প্রতীক্ষমাণ, যারা সেখানে আসবে তারা যে পরস্পরেই পূর্ণ হবে না, এমন উদ্বেগের রেখা, এমন সংশয়ের লক্ষণ, নির্বিকার বালিশে চাদরে তিলমাত্র নেই।

মীরা ও-ঘরে ?

পাশের ঘরটি ছোটো, সেখানে নীল মৃদু আলোয় আবছা হ'য়ে ঘুমোচ্ছে পাশাপাশি খাটে বান্টি বুলবুল, আর বান্টির পাশে আড় হ'য়ে মীরা। একটু তাকিয়ে থাকলো সোমেন, যেন ভেবে-ভেবে সকলকে চিনলো। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা। সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে আপন, রক্তে মাংসে স্বার্থের পরমাণুতে এদেরই সঙ্গে জড়িয়ে আছি। এ-বাঁধন কি ছেঁড়বার ? মীরার মুখে চোখ পড়লো তার, থেমে থাকলো সেখানে ;— কত কালের চেনা, দিনে-দিনে কত নিবিড় সহবাসের চিহ্ন-আঁকা মুখ।

এ-বাঁধন কি ছেঁড়বার? যদি কেউ উদ্ধত হাতে ছিঁড়েও দেয়, তবু কি তার কুটিল জাল, অরণ্যের গোপন ঘন লতাজালের মতো, মনের তলায় পাকে-পাকে ঘিরে থাকে না?

মীরা নড়লো, চোখ খুলেই বললো, 'এসেছো?'

'এই এলাম। তুমি খাওনি?'

কথার জবাব না-দিয়ে মীরা উঠতে-উঠতে গায়ের কাপড় ঠিক করলো। সোমেন বললো, 'বড্ড দেরি হ'লো আমার!'

'এতক্ষণ খাটিয়ে নিলে গাঙ্গুলি!'

'আর বলো কেন।' দুর্বল মিথ্যা ক্ষীণ শব্দে বেরোলো, শোনালো যেন বিশ্বাসযোগ্য পরিশ্রান্ত স্বর।

'কেমন মানুষ বলো তো! চব্বিশ ঘণ্টার চাকর রেখেছে নাকি? গাঙ্গুলির না-হয় বৌ ম'রে ভূত, কিন্তু অন্য মানুষের তো ঘরসংসার আছে, শরীরেও তো সওয়া চাই! ক-দিন চলবে এ-রকম?'

'খুব বেশি দিন কি আর!'

(কিন্তু কে জানে। কত দিন চলবে এ-রকম কে জানে। কোথায় এর শেষ কে জানে।)

'কী অন্যায় কথা রোজ-রোজ—রতন, খাবার দাও!'

এই সহানুভূতি কাঁটার মতো বিঁধলো সোমেনকে। কষ্ট হ'লো মীরার জন্য, প্রায় করুণা। হায় ইন্দ্রিয়, হায় মানুষের জগদ্বিখ্যাত চোখ, সেও এত অক্ষম? অতি সূক্ষ্ম স্ত্রীর চোখ, সেও অন্ধ? এখন, এই মুহূর্তে, কেউ কি তাকে দেখে ভুল করতে পারে? মনের মধ্যে জলছে সে, মুখেও তার আভা কি দেয়নি? পানের দোকানে সিগারেট কিনতে থেমেছিলো, আয়নায় চোখ পড়েছিলো একবার। দেখেছিলো চিকচিকে চোখ, সতেজ মুখ, ঋজু ভঙ্গি, নিজের

যে-ক্লান্ত ফ্যাকাশে মার-খাওয়া চেহারার সঙ্গে নিত্য তার অপ্রিয় চোখোচোখি, তার সঙ্গে তফাৎ দেখে অবাকই হয়েছিলো। আর মীরা যে-খবরটা শুনেছে, বুদ্ধিতে যা জেনেছে, তার পরদা সরাতে পারলো না? বুদ্ধি, পরম বান্ধব, কিন্তু সেও কেমন ঠকায়!

(তাই তো প্রতারণা সহজ।)

খুদে খাবার ঘরে—আসলে ভাঁড়ার ঘর সেটা—খেতে বসলো দু-জনে। খিদের ধার একটুখানি মিটিয়ে নিয়ে মীরা কথা আরম্ভ করলো।

'দাদা তোমাকে টুরের কথা কিছু বললেন?'

'টুরে যাচ্ছেন বুঝি?'

'যান তো প্রায়ই, বৌদিকেও নিয়ে যান মাঝে-মাঝে—এবার আমাকেও যেতে বলছেন।'

'বেশ তো।'

'কাছেই—আসানসোল রানিগঞ্জের মাঝামাঝি। দাদার আপিশের বাংলো আছে সেখানে—সুন্দর নাকি দৃশ্য—আর কাছাকাছি মোটরে বেড়াবার জায়গাও আছে অনেক। মোটরেই ওঁরা যাবেন এবার। দাদার গাড়ি তো আছেই—আমি গেলে আপিশের একটাও নিয়ে নেবেন। ছেলেপুলে সব সুদ্ধু যাওয়ার কথা হচ্ছে।

'ভালো কথা।'

'দাদার টুর বেশি দিনের না, কিন্তু বৌদি বোধহয় মাসখানেক থাকবেন—দাদা মাঝে-মাঝে যাওয়া-আসা করবেন আরকি। তুমি বলো তো ঘুরে আসি। সবরকম সুবিধে—খরচ প্রায় কিছুই না, আর শীতকালে শুকনো জায়গায় বাপ্টির টনসিলের উপকার হতে পারে। অবশ্য ওদের স্কুল কামাই হবে—কিন্তু বৌদি ক্রিসমাসের ছুটির আগেই ফিরে আসবেন।'

খেতে-খেতে, থেমে-থেমে, সোমেনের দিকে বেশি বার না-তাকিয়ে, মীরা কথা বলছিলো, কিন্তু সোমেন শুনছিলো যতটুকু, দেখছিলো তার অনেক বেশি। মীরাকেই দেখছিলো। আজ মীরার তুষ্টিসাধন সে পেরেছে, তাই কি মীরা সুখী? তাই তার ঠোঁটের রেখা কোমল, কপাল অত শান্ত, আর তাই কি বৌদির সঙ্গে আসানসোলে বেড়াতে যাওয়ার কথাটাও নম্র ক'রে উত্থাপন? না। মনে হয় তা-ই, মনে হবার কারণ আছে, আপাতপ্রমাণ অনেক আছে, কিন্তু—সত্যি বলো, সোমেন, সত্যি তোমার তা-ই মনে হয়? কে ব'লে উঠলো তার মনের মধ্যে—না, তা নয়, তা নয়, এ-ই নিয়েই মীরা তোমার ঘরে এসেছিলো, এ-ই তার দেবার আছে তোমাকে—হ্যাঁ, এখনো আছে—তুমি যদি নিতে না পারো, এখন আর নিতে না পারো, তোমারই সেটা অযোগ্যতা। শরীরের সুপক্ক ফলে সত্যের যে-শাঁস ছিলো, তা এখনো পোকায় কাটেনি: পোকা পড়েছে তোমার হৃদয়ে, তোমারই বিশ্বাসহন্তা হৃদয়ে। মনে ক'রে ভাখো এই শরীরকে কত ভালো তুমি বেসেছিলে, বেসেছো: সেই কাম, কামের মন্থন, তারই দুরন্ত পথ ধ'রে অন্য কোনো সূক্ষ্ম সুকুমার অতিথি, যার নাম নেই, নাম জানা যায় না, সূক্ষ্ম হ'য়েও যে সক্ষম, প্রায় অগোচরেই প্রভাবশীল—অতিথি ঠিক নয়, সহবাসী, বলতে পারো অভিভাবক, সেই অন্য কেউ কি তোমাদের কাছে পৌঁছয়নি? তাকে তুমি তাড়িয়ে দিলেও সে কি ভেবেছো চ'লে যাবে?

একটি সজনে ডাঁটা আঙুলে তুলে মীরা বললো, 'কিছু বলছো না?'

সোমেনের হঠাৎ একটা অদ্ভুত অনিচ্ছা হ'লো মীরাকে এই সময়ে যেতে দিতে। একটু দেরি ক'রে জবাব দিলো, 'তুমিও এক মাসই থাকতে চাও?'

মীরা বুঝলো স্বামীর অনিচ্ছা, মনে-মনে খুশি হ'লো।

'না, একমাস কেন—এই, ধরো দশ-বারো দিন? রতন পুরোনো লোক—তোমার কিছু অসুবিধে হবে না। আর তুমিও তো আসতে পারো শনিবারে।'

'কবে যাচ্ছো তোমরা?'

'বুধবার কথা হচ্ছে।'

'পরশু?'

'পরশু। আসবে তুমি শনিবারে? তোমার ভালো লাগবে—আমার তো মনে হয়।'

'সময় কি হবে। সিনেমার লেখাটা—'

'হ্যাঁ—তোমার লেখাটা আজ পড়লাম সব। খুব ভালো হচ্ছে।'

'নাকি?'

'আমার তো খুব ভালো লাগলো।' ব'লে, যেন অনুমোদনের আশায়, মীরা সোমেনের চোখে চোখ রাখলো।

সোমেন চোখ নামালো খাবার থালায়। যত বড়ো অনিচ্ছা নিয়েই হাতে নিই, হেলাফেলা ক'রে কিছুই লেখা যায় না, কোনো-কিছুই না;—হোক বাজে, নিজের কাছে তুচ্ছ, শুধুমাত্রই রান্নাঘরের খিড়কিদোরের জোগানদার—কাগজে একবার কলম ছোঁওয়ালে সে তার খাজনার এক কড়িও ছাড়ে-না, অন্য কিছুই মনে থাকে না তখন—পরিশ্রমের প্রকাণ্ড ভারে পিঠ তেমনি বেঁকে যায়: আবার সেই লেখা, যেমন কোনো-কোনো লেখা লিখতে না-পেলে ম'রে যাই, তেমনি যে-লেখা লিখতে না-হ'লে বেঁচে যেতাম, সেই লেখাও যখন কেউ ভালো বলে তখন এমন সাধ্য কী যে খুশি হবো না! তাই তো বাজে লেখা এত বাজে, এমন নিদারুণ শোচনীয়;—

যেন খরচপত্র হুলুস্থুল সবই হ'লো, কিন্তু উনুন থেকে নামতে-নামতেই ব্যঞ্জন প'চে গেলো, গন্ধে যারা ছুটে এলো তাদেরও জিভ টকতে দেরি হ'লো না।

(তবে যে-ক'দিন না টকে, তারই মধ্যে পরেশবাবু পুষিয়ে নেবেন।)

মাছের ঝোল পাতে নিয়ে সোমেন বললো, 'তোমার জজদার পছন্দ হবে মনে হয় ?

'ওঁদের তো আর নিজেদের কোনো পছন্দ নেই—লোকে নিলেই লক্ষ্মী। তুমি তো লিখে দিলে, এখন ফিল্মটা ওঁরা ভালোরকম করতে পারেন তবে তো!' কই মাছের কাঁটা ছাড়াতে গিয়ে মীরা হঠাৎ থামলো। 'জজদার এবার ফেরা উচিত। বম্বে গেছেন দিন পনেরো হ'লো না ?'

সোমেন একটু ভেবে বললো, 'তা তো হ'লোই।'

'এর মধ্যে একটা খবর-টবর দিলে পারতেন। তা দাদা সব বললেন ওঁদের কথা—ভাবনা নেই কিছু।'

হঠাৎ, এক মুহূর্ত, সোমেনের হৃৎপিণ্ড যেন বন্ধ হ'লো। ভাবনা ?···তাহ'লে ভাবনার কারণ আছে ? এমনও কি হ'তে পারে যে···এর বেশি ভাবতে, কথাটা পুরো ক'রে ভাবতে, সোমেনের মস্তিষ্ক রাজি হ'লো না, তবু সেই জটিল কারখানার কেন্দ্রস্থলে হাতুড়ির বাড়ির মতো এই কথাটা স্পন্দিত হ'তে লাগলো যে সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে সর্বনাশের ব্যবধান শুধু দৈবের। শুধু কথা, শুধু একজনের মুখের কথা—আর এমন একজনের যাকে সে চেনে না, আগে ছাখেনি, যার হাবে-ভাবে বিশ্বাসযোগ্যতার লক্ষণ খুব নেই, আর যার বিষয়ে কিছুই সে জানে না—এমন একজনের মুখের কথায় নির্ভর ক'রে কী করলো সে এ-কয়দিনে, কী না করলো সে!

জোচ্চোরির কয়েদখানায় সে বন্দী আজ, তার মুক্তিদাতা একমাত্র পরেশ লাহিড়ী! যদি পরেশ লাহিড়ী আর না আসে, কিংবা এসেও বলে হ'লো না—তাহ'লে—তা হ'লে—

'কী ভাবছো? খাচ্ছো না?'

সোমেন চেষ্টা ক'রে খেলো একটু। চেষ্টা ক'রে কথা বললো, 'কী বললেন তোমার দাদা?'

'ভালোই বললেন। সিনেমার মহলে বীরেশ লাহিড়ীর খুবই তো নামডাক, বাঙালি কোম্পানীর মধ্যে বাণীরূপাই বড়ো এখন। ছবিটিও তৈরি হয়েছে—সেও উঠে যাবে ঠিক—আর তোমার "জন্মান্তর" নিয়েও দাদা বললেন খবর নেবেন।'

এক ঢোঁক জল খেলো সোমেন। গলা ভিজিয়ে বললো, 'পরেশ লাহিড়ী ফিরলেন কিনা খবরটা একবার নিলে হ'তো।'

'এসেই যাবে দু-একদিনের মধ্যে। কাজে গেছে—বোধহয় এই "জন্মান্তরে"র কাজেই—কাজ ফুরোলে তবে তো—' মাছের গায়ে টম্যাটোর চাটনি একটু মেখে নিয়ে মীরা কথা শেষ করলো—'আসবে ঠিক সময়মতো।'

মীরার প্রত্যেকটি কথা, তৃষ্ণায় বিন্দু বিন্দু জলের মতো, সাগ্রহে পান করলো সোমেন। তার দিকে তাকিয়ে দেখতে আরাম, তার সুস্থ পরিচ্ছন্ন মনোযোগী খাওয়ার দিকে তাকিয়ে দেখতে আরাম। তাকে এখন যেতে দিতে অনিচ্ছা আরো প্রবল হ'লো তার, ঠিক এখন, এক্ষুনি না-ই বা গেলো—ক'টা দিন পরে ওঁরা তো মাসখানেকই থাকবেন—কথাটা প্রায় জিভের ডগায় তৈরি হ'য়েও উঠেও এলো, কিন্তু তখনই আবার কথা বললো মীরা।

'তোমার লেখা তো প্রায় শেষ ক'রেই এনেছো দেখলাম। এসো না

একবার আসানসোলে। বড্ড তোমার খাটুনি যাচ্ছে—তবু একটু বিশ্রাম, দু-দিন একটু খোলা হাওয়া।'

যদিও শ্রীশক্তিবাবুদের সংসর্গ সোমেনের মোটে পছন্দ না, আজ সে মনে-মনে ইচ্ছুক হ'লো। 'আচ্ছা, পারি তো যাবো।'

'চাও তো ওখানে ব'সেও লিখতে পারো। এই রাত জেগেজেগে শরীর না শেষটায়—মাছটা খেলে না?'

'এই খাচ্ছি।'

সোমেন হঠাৎ বুঝলো এতক্ষণ সে প্রায় কিছুই খায়নি। খিদের বোধ জাগলো, ফুলকপি মটরশুঁটির পাৎলা কই মাছের ঝোল ভালো লাগলো মুখে, খাবার পরে ঠাণ্ডা জল ভালো লাগলো।

না, ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। পরেশবাবুকে আসতেই হবে, আমার হাতে টাকা আসতে বাধ্য। আমি থাকতে মালতী সেন ভেসে যাবে তা কি কখনো সম্ভব? অসম্ভব;—তাই তো যখন আমার সঙ্গে দেখা হ'লো, ঠিক তখনই—এত কাল পরে—সিনেমার লোকের চোখ পড়লো আমার লেখায়। সিনেমা বাজে?…কিন্তু আমি তো আর বাজে নই, তুচ্ছ নই, আমি এখন জীবনের যোগ্য, জীবনের নতুন অর্থ আমি পেয়েছি, যত আমার এতদিনের লজ্জা আর গ্লানি—সে-সব তো আর কিছুই নয়, এই নতুন মূল্য উপার্জনেরই জন্ত যন্ত্রণাভরা আনন্দিত প্রস্তুতি। বন্দী আমি ছিলাম—আমারই মধ্যে, 'আমি'র মধ্যে বন্দী—কিন্তু আর না, অবরোধ ভেঙে-ভেঙে খ'সে পড়ছে, বেরিয়ে আসছি, ভাঙছি, আবার আমি নতুন হচ্ছি।

রাস্তার দিকে ছোট্ট বারান্দা, সোমেন খেয়ে উঠে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। রাত্রি এখনো উষ্ণ, হাওয়ায় এখনো বসন্তের তরুণতা। ধোঁয়া নেই, পাৎলা একটু কুয়াশা স্বপ্ন-পাওয়া চোখের

মতো লেগে আছে। আর সেই চাঁদ, যাকে দেখেছিলো লেকের আকাশে রাজ্ঞীর মতো, যার রুপোলি আঁচল ছড়িয়ে প'ড়ে তুচ্ছ তারা খুঁটিয়ে নিয়েছিলো, সেই চাঁদ এখন কোন স্বর্গীয় বিরহিণীর ক্লান্ত করুণ অবহেলিত স্তনের মতো নিঃসঙ্গ ঝুলে আছে। অস্তমান, তামার মতো লাল, এগিয়ে-আসা তারার ভিড়ে পশ্চিমের প্রান্তটুকুতে অগৌরবে আশ্রিত, তবু···আশ্চর্য, বিশ্বপ্রকৃতিতে কিছুই কি অসুন্দর নেই? কিছু নেই যা পুরোনো হয়? কিছু নেই যা ফিরে আসে না?

'তুমি এখানে?'

সোমেন একবার মীরার দিকে তাকালো, আবার চোখ সরালো দূরে, রাত্রির নীলিমায়।

'সুন্দর হয়েছে তো চাঁদটা,' মীরা আস্তে এসে সোমেনের পাশে দাঁড়ালো। একটুক্ষণ কেউ কিছু বললো না। একটি মুহূর্ত, একটি হঠাৎ-পাওয়া অকালের ফলের মতো, ভাগ ক'রে নিলো দু জনে। তারপর মীরা বললো 'তোমার শীত করছে না?'

'শীত?···না তো।'

'হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ঘরে এসো।'

'যাচ্ছি।'

আবার একটু চুপ ক'রে থেকে মীরা বললো, 'আজ আর লিখতে বোসো না রাত্রে। এখন শোও।'

সোমেন সিগারেট ছুঁড়ে ফেললো। 'হ্যাঁ, শুই।'

ঘুম পাচ্ছে, ঘুম, পরিশ্রমী সংকর্মের মহামূল্য উপার্জন। একদিন সে সব অভ্যেস বদলে ফেলবে; সিগারেট ছেড়ে দেবে, রাত্রে শিগগির শুয়ে উঠবে আবার রাত থাকতে···গ্রামে চ'লে যাবে, মাচা তুলবে কুমড়োর, লিখবে একটু-একটু ক'রে যত কথা এতদিন ধ'রে মনের মধ্যে

…সাধুতার স্বাদ জানবে; সৎ, দরিদ্র, পরিচ্ছন্ন জীবন—তার মতো মধুর আর কী, তার মতো আনন্দ আর কোথায়।

…বিছানায় ঘুম তাকে মোহন হাতে টানলো, কিন্তু তখখই ধরা দেয়া হ'লো না। অন্য বাহু, অন্য এক মোহিনী শক্তি…শরীরের প্রতিটি তন্তু জেগে উঠলো তার, প্রায় ভুলে-যাওয়া রাত্রি যেন, উন্মাদনার, পূর্ণতার…অন্য একজনকে সমৃদ্ধ ক'রে নিজেও সমৃদ্ধ হওয়ার সার্থকতা। আর তার অনুরণন যখন মিলিয়ে এলো, ঘুম নামলো সুখের ভারে মূর্ছার মতো, তখন সেই ঘন কালো পটের উপর, কালোয় ডুবে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে, হঠাৎ মালতী সেনের মুখটি উজ্জ্বল ফুটে উঠলো তার সামনে।…কার প্রাপ্য তাপ কাকে তুমি দিলে, সোমেন!

ঘুমের ঘোরে কেউ তা জানলো না।

১৪

২৩ নবেম্বর

প্রিয়তমা, সুন্দরীতমারে—
যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার—
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার!

ছড়ায় সে আমার জীবনে
লবণাক্ত বাতাসের ধার,
তৃপ্তিহীন আত্মার গহনে
গন্ধ ঢালে চিরন্তনতার।

শাশ্বত সৌরভ মাখে হাওয়া
কৌটো থেকে, কোনো প্রিয় ঘরে,
সংগোপনে, কোন ভুলে যাওয়া
ধূপদানি জ্বলে রাত্রি ভ'রে ;—

কেমনে, অজেয় প্রেম, ধরি
ভাষায় তোমারে অবিকার,
এক কণা অদৃশ্য কস্তুরী
অসীমের অন্তরে আমার!

সে-উত্তমা, সুন্দরীতমারে—
স্বাস্থ্য আর আনন্দ আমার—
অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
অমৃতেরে করি নমস্কার!

ওরা অবাধ্য হ'য়ে উঠছে। শাসন মানে না। অধীর, ঘুরে-ঘুরে পংক্তি সাজিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে; ওদের হালকা ছোটো আস্তে-ছোঁওয়া পায়ে কত নতুন চিন্তা এসে নামছে…যেন আর আমারই এখন স্বাধীনতা নেই, আমি আর ওদের যেন লিখবো না, আমাকেই লিখবে ওরা। কে তুমি কবি, আমাকে আজ রচনা করতে হাত বাড়ালে, আমি তোমাকে কেমন ক'রে সহ্য করি! আমি তো গুরুতার বিনয় শিখিনি, আমার দুর্বল হাত বার-বার কেঁপে ওঠে, নিজেই চায় মুখর হ'তে, তুমি হ'তে—এই স্পর্ধা কেমন ক'রে সহ্য করি!

না। আমি লিখবো, নিজে কিছু কথা বলবো, এ যেন—এখনো—বড্ড বেশি। কবিতার কঠোর পাহাড় যে চড়তে পারে সে কি আমি?…সে কি আমি! সেই নগ্ন ধূসর শিখর, ঘাস যেখানে জন্মে না, অথচ যার পাথর ফেটে পুণ্য প্রস্রবণ নামে…তৃষ্ণার জল, আমাদের তৃষ্ণার ঠোঁটে অমৃত…আমি আছি তার পায়ের তলায় সবুজ বৎসল উপত্যকায়। কত তারা—হায় রে, কত!—সেই রম্য কাননেই দিন যাদের কেটে যায়, শুধু পাখির ডাকে ছায়ার সুখেই মধুরবরন দিন যাদের কেটে যায়!…আমি? আমি—এত দিনে—উপত্যকার প্রান্তে মাত্র—প্রান্তে অন্তত—দাঁড়িয়েছি, যেখানে ছায়া কম, কুহুতান কচিৎ, শির-ওঠা পাথুরে মাটির যেখান থেকে আরম্ভ, আর যেখান থেকে… আরো বলবো?…কিন্তু কী বলবো? কী আমি বলতে পারি?…

সুদূর সেই চূড়া, অস্পষ্ট চোখে পড়ে, দুর্বল চোখে সইবার মতোই অস্পষ্ট…ঐ তার করুণাভরা নিষেধ…সাহস কোরো না, এর বেশি সাহস কোরো না, ফিরে যাও।

বড্ড বেশি—আমার কিছু বলতে যাওয়া বড্ড বেশি। কিন্তু আর যেন চুপ ক'রেও থাকতে পারি না। তাই এই অনুবাদ, সঙ্গে থেকে ব'সে-ব'সে এতক্ষণ। বলতে যদি নাও পারি এখনো, শুনতে পারি তো! একমনে, মনে-মনে শুনতে পারি—মনে-মনে বলতেও কি পারি না? যাঁরা দেখেছেন, জেনেছেন, পৌঁচেছেন, থামেননি কোথাও, রসাতলের অতল পাঁকে পারিজাতের শিকড় ছুঁয়েছেন; যাঁদের চোখ, যে-চোখ মনে হয় যেন আতঙ্ক দেখে পাথর, সে-চোখেই অশ্রু ফোটে পবিত্রতম করুণা—তাঁদের কোনো কথা, কারো কথা, মনে-মনে বলতেও কি পারি না? এই কবি, যিনি সীমান্ত পেরিয়েছিলেন, কিন্তু তার পরে আর সইতে পারলেন না—তবু, নিজের উপর বুদ্ধিনাশের অভিশাপ এনেও, সীমান্ত যিনি পেরিয়েছিলেন; কিছুই বাদ দেননি—রোগীর বমি, বেশ্যার কেলি, পশুর গলিত শবের ভোজোল্লাসী নধর ক্রিমিপুঞ্জ;—অকথ্য ভয়, বীভৎস ক্লেদ, জীবনের পরতে-পরতে বিকারের ক্রমবিকাশ, অবিরল প'চে-প'চে যাওয়ার স্তরের পর উন্মীলিত স্তর—এই নরক পার হ'তে পারলে তবে-না অমৃতপুত্র, তবে-না আনন্দের মন্ত্রোচ্চারণে অধিকার!

আমি, আমিও আজ স্বাদ নিলাম, সঙ্গে থেকে ব'সে-ব'সে এতক্ষণ, পরোক্ষে, পরের মুখে, তবু সন্দেহ নেই অমৃতেরই আস্বাদ। পড়া, শুধু পড়া, শুধু নিষ্ক্রিয় ভুঞ্জন, যথেষ্ট আর মনে হয় না; হাত যেন তুলতেই হবে, ছুঁতে হবে পলাতকার আঁচল, ধ'রে রাখতে হবে স্পর্শটিকে কোনোখানে, নতুন কোনো পাত্রে, যে-পাত্র নিজে আর হ'তে পারি না, কিন্তু

আমারই হাতে তৈরি হওয়া চাই। স্বর্গে যদি যেতে চাই স্বর্গ আমাকে সৃষ্টি ক'রে নিতে হবে,—অন্তত কোনো ছায়া, প্রতিবিম্ব, প্রতিলিখন··· যতটুকু সৃষ্টির ক্ষমতা ততটুকুই আমাদের অধিকার···কবিতার অনুবাদ নিয়ে সব তর্ক শেষ হ'লে পর এই তার সার্থকতা থাকেই। প'ড়ে আর তৃপ্তি হয় না যখন, বার-বার আবৃত্তি ক'রেও মনের তাপ মিটতে চায় না, অথচ ঠিক স্বাধীনতারও সাহস নেই, তখনই অনুবাদের লগ্ন ;—এমন কবিতা, যা আমার মনের কোনো-এক আশ্চর্য নীরবতায় আশ্চর্যতর সুর তোলে, যেন আর-একটু হ'লে আমিই লিখতাম, কেমন ক'রে না-লিখে পেরে-ছিলাম তা-ই ভেবে অবাক লাগে প্রায়, আর লিখিনি ব'লে অনন্তকালেও আক্ষেপ জুড়োবে না মনে হয়—তেমনি কোনো হঠাৎ-পাওয়া অন্য ভাষার কবিতা, তাকে যদি নিজের ভাষায় মনোমতো গড়তে পারি—তবে তাকে পাওয়া আমার পূর্ণ হ'লো, কবিতাটি আমার হ'লো এতক্ষণে—অন্তত এই অর্থে আমার যে রচনায় পরিশ্রমের মূল্যে আমি তাকে উপার্জন করলাম···হয়তো শুধু তাকেই নয়···হয়তো··· কবিতাকেও—কবিতাকেই।

তা-ই মনে হচ্ছে এখন। স্পষ্ট লাগছে, পরিচ্ছন্ন, প্রশান্ত। ভুল? এটাও ওদের ছলনা? বেশ, আরো কিছু পরখ করা যাক। চুপ ক'রে থাকবো, ভাণ করবো ওরা আমার কেউ না। কিন্তু যতই আমি পালাতে চাই ততই ওরা প্রবল। ধ'রে ফেলবে—ওদের নিশ্বাসের হলকা পাচ্ছি।

এখন যেন সমস্তই অনুকূল। সিনেমা লেখা শেষ—কী শান্তি!— চুপচাপ একলা বাড়িতে আজই বিকেলে শেষ হ'লো। সামনে প'ড়ে আছে এক তাড়া কাগজ হ'য়ে আমার রাত্তির-জাগা মগজমন্থন পরিশ্রম —পণ্ডশ্রম!···তবু, ভেবে দেখছি লিখতে-লিখতে তাতেই মন

তেতেছিলো—দেবীদাসের 'বিশ্বরূপে', তা-ই হয়, আমারও হয় পদ্মমার্কা বিজ্ঞাপনে। কথা, কথা, কী মায়া জানো তোমরা, যে কোনো ছুতোয় তোমাদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতেই কি ভালোবাসি?···আশ্চর্য লাগে ভাবতে, মনে হ'তে পারে সুখের কথাও—কিন্তু এখানেই আবার বিপদ, আশঙ্কার অন্ধকারও এইখানে। যেহেতু তুমি কথার কারিগর, তুমি কি ভেবেছো বলাৎকার চালাতে পারো? জানো না তুমি, প্রাণ আছে তার, তারও ইচ্ছা আছে, অনিচ্ছা আছে, দারুণ প্রতিহিংসা জানে সে;—যাকে চৌরাস্তায় নাচিয়ে তুমি বখশিষ পেলে বাহবা নিলে, কোনোদিন আবার যখন ঘরে ডাকবে, আর যদি ফিরে না পাও?

···শুদ্ধ হ'য়ে থাকতে হবে এর পরে, মনের মধ্যে, ভিতরের দিকে অস্পৃষ্ট, প্রার্থনা নিয়ে, এ ফে এসো, আমার ঘরে এসো, বেরিয়ে এসো আমার ঘুম থেকে স্বপ্নে, স্বপ্ন থেকে জাগরণে, এসো আলোয়, এসো নির্ভয়ে, প্রকাশিত হও।···অনুবাদটি পড়লাম আর-একবার, এই কালো খাতার কিছু লেখাও···আপিশের বাইরে এতগুলি পাতা কবে গিগগির লিখেছি মনে পড়ে না!···ধন্য পরেশবাবু, ধন্য মীরার ঘুঘুডাঙা—কী ওরা উশকোনি দিলো দুয়ে মিলে, লিখতেই হ'লো আবার··· আর এখন···এখন মনে হচ্ছে থামতে পারি না, একটার টানে আর-একটা আসছে—যেন আর ধোঁয়া নেই, উনুনে হাওয়া দিতে হবে না, তৈরি আঁচ গনগনে।

সেইজন্য সপ্তাহান্তে আসানসোল গেলুম না। মীরা চিঠিতেও লিখেছিলো, বাক্সও গুছিয়েছিলুম একবার—কিন্তু না, কোথাও যেতে হবে না, কোন দেশ কী বেশি দিতে পারে, মন যখন সুরে বাঁধা? হাওয়া-বদল? সিনেমা লেখা শেষ ক'রে কবিতার অনুবাদ, আর

অনুবাদের পরে নিজেই যদি সাহস পাই—এর চেয়ে স্বাস্থ্যকর বলো তো কোন হাওয়া-বদল!

কাল বিকেলে আপিশ থেকে ফিরেছি, তারপর আজকের এই রবিবারের রাত্রি পর্যন্ত বাড়ি ব'সেই কাটলো। একলা বাড়িতে মাঝে-মাঝে মন্দ না—যেন নীরবতার গতিশীল বিস্তার, সমুদ্রের যেখানে ঢেউ নেই সেইরকম, মনে হয় শেষ নেই, কোনোদিন ফুরোবে না। পথের হল্লা তেতলায় তেমন পৌঁছয় না, আর যদি-বা কোনো আওয়াজ ওঠে, জলের বুকে আঁচড় কেটেই ডুবে যায়। অবস্থাটা উপভোগ করছি—আরো কেউ-কেউ করছে ব'লে মনে হয়। ফুর্তিতে আছে ইঁদুর—এ-বাড়িতে অনেক তারা—ঠিক বুঝেছে আমাকে তেমন ভয় নেই, দিব্যি বেরিয়ে আসে আমার সামনে, ধূসর দ্রুত দৌড় দিয়ে হঠাৎ আবার কোথায় যেন পলায়। আমি এই টেবিলে ব'সেই চা-রুটি খাই, রুটির গুঁড়ো চিনির গুঁড়ো চটপট খুঁটে নেয় ওরা, মাঝে-মাঝে টেবিলের তলায় আমার পায়ের আঙুলেও একটু ভুল ক'রে ঠুকরে দেয়—সেটাও আমার মন্দ লাগে না। মীরার ওরা দু-চক্ষের বিষ; আমিও, হাইজীন-জানা আধুনিক, তেমন সুনজরে ওদের দেখতুম না, কিন্তু এ-ক'দিনে দেখতে-দেখতে ভালো লাগছে।

নীরবতার দিন কাটলো আজ, অখণ্ড, আস্ত, কোথাও জোড়াতালি নেই, কোনো-কিছু শেষ করার দিন—কোনো-কিছু আরম্ভ করারও দিন? যদিও রবিবার, ঠিক যেন দিনক্ষণ বুঝেই আজ কেউ আসেওনি সারা দিনে—না, একজন শুধু একটুখানি এসেছিলো। সন্ধের পরে দরজায় টোকা, রতন বললো ছোটো একটি ছেলে। ছোটো ছেলে? আমাকে চায়? গিয়ে দেখি, ফন্তু।

'কাল আপনি যাননি, আজও গেলেন না, মা তাই—'

'তাই তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন?'

'আপনি ভালো আছেন তো? অসুখ করেনি?' মা-র কথার নির্ভুল আবৃত্তি করলো ফল্গু।

'না, না, অসুখ করেনি। ভালো আছি। তোমাদের খবর কী?'

'খবর কিছু না—' ফল্গু হঠাৎ একটু লজ্জা পেলো। 'মা বলছিলেন এখন যদি একবার—বেশি তো রাত হয়নি এখনো—যদি একবার আসতে পারেন—'

অন্য যে-কোনো দিন, অন্য যে-কোনো সময়ে তক্ষুনি উঠে আমি চ'লে যেতাম। কিন্তু আজ গেলাম না। মাথার মধ্যে পদ্য ঘুরছে তখন, কথার সঙ্গে কুস্তি চলছে জোর। এখন ছেড়ে উঠবো?

'তোমার মা-কে বোলো, ফল্গু, আমি কাল যাবো। সন্ধেবেলা—আপিশ থেকেই যাবো।'

'কাল?…আচ্ছা।…আমি চলি তাহ'লে?'

'আচ্ছা—' আমি উঠে দাঁড়ালাম।

পরে মনে হ'লো ঠিক করিনি। ওকে একটু বসতে বলা উচিত ছিলো, কিছু খাওয়ানো, কথাবার্তা কিছু। কেমন শুকনো মুখে কাঠখোট্টা বিদায় দিলাম! মনের মধ্যে খচখচ করলো একটুক্ষণ, কিন্তু বদলেয়ারের খোলা পাতা আবার সব ভুলিয়ে দিলো।

ছেড়ে উঠতে পারলাম রাত দশটার আগে না, নয়তো ঘুরে আসতাম একবার। কোনো দরকার? তার বোনের বিয়ের তারিখ পড়েছে অঘ্রানের উনিশ তারিখে, ডিসেম্বরের চার—পরেশবাবুর শিগগির এখন এসে পড়া চাই। হয়তো ফিরেওছেন এত দিনে, একবার খবর নিলে হ'তো—কিন্তু তাঁর কাজেই ব্যস্ত ছিলাম এ-কয়দিন।

সোমেন কলম নামালো, চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে চোখ বুজলো। আঃ! আজ ঘুমুবে! কিন্তু কই, ঘুম তো পাচ্ছে না তেমন, জেগে-জেগে জাগাটাই কি অভ্যেস হ'লো?—হ্যাঁ, মীরাকে চিঠি—এখনই লিখে ফেলা যাক—কেমন মনে হচ্ছে আরো কিছু লিখলে হয়। আবার নিচু করলো পিঠ, কাগজ টানলো সামনে। 'কিছুতেই যেতে পারলুম না, তার কারণ—'; 'যাইনি ব'লে রাগ করলে? এদিকে—'; 'যাবার খুব ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু—'; বিশ্রী এটা—স্ত্রীকে চিঠি লিখতে ব'সেও বাক্যরচনার দুর্ভাবনা!···থাক—কাল সকালেই—এখন শুয়ে পড়ি।

১৫

সন্ধ্যার পরে, ওয়েলিংটনের মোড়ে, যেখানে নগরের ধমনী ট্র্যামের লাইনে নানান দিকে বেঁকেছে, যেখানে ফুটপাতে একটু দাঁড়ালে ধাক্কা দিয়ে অন্যেরা চ'লে যায়, হাতের পর হাত বাড়ায় নোংরা ভিখিরি, আর পুরোনো বইয়ের দোকানে জঞ্জালের স্তূপ ঘেঁটে রত্ন খোঁজে চশমা-পরা ছাত্র—সেখানে, বীরেশ লাহিড়ীর চৌতলার আপিশ থেকে এইমাত্র নেমে এসে, এখনই আবার ট্র্যামের ঠেলাঠেলি? না, পারবে না, কিছুতেই না। মনিব্যাগ ফাঁক ক'রে দেখলো—একটি পাঁচ টাকার নোট—আর বাড়িতে তার দেরাজে—থাক, টাকার কথা আর ভাববে না—সব ভাবনা শেষ হোক।

—'ট্যাক্সি!'

ট্যাক্সি বেঁকলো ওয়েলেসলিতে, সোমেন পা ছড়িয়ে চোখ বুজলো। কেন, কেন এত ভেবে-চিন্তে খরচ করা, কেন কষ্ট পাওয়া, ইচ্ছাকে চেপে রাখা—শেষ পর্যন্ত কিসের কোন অর্থ থাকে? হবেই—খরচ হবে সব, যা-কিছু তুমি পেয়েছো, না চাইতে পেয়েছো; যা কিছু তুমি চেয়েছো, চেষ্টা ক'রে পেয়েছো; যা-কিছু তোমার পরিশ্রমের বা প্রতারণার উপার্জন;—অর্থ, স্বাস্থ্য, যৌবন—তোমার জীবন—সবই তো আগে থেকেই লেখা হ'য়ে আছে প্রত্যাহরণের অতীত কোনো খাতায়, লোকশানের লাল কালিতে জলজলে। সঞ্চয়? সুবুদ্ধি? দূরদৃষ্টি? অবক্ষয়ের বাসা তোমার মধ্যে, বিরাম নেই তার, ক্ষমাহীন, কোথাও

গেলে বাঁচবে না, কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না তাকে। তিলে-তিলে ঘটছে ব'লে বুঝতে পারো না—তাই খাটছো, ঠেলছো অন্যকে, নিচে থেকে উপরে উঠতে গিয়ে প'ড়ে যাচ্ছো কত বার, অধম হ'য়েও মাটি আঁকড়ে প'ড়ে থাকছো। কিন্তু তার চেয়ে এ-ই কি অনেক ভালো নয়, জানতে পারাই কি ভালো না? সর্বনাশের মনোরম ঘোমটা যখন ছিঁড়ে যায়, হঠাৎ আসে উলঙ্গ কোনো বিস্ফোরণ? সে-ই কি অনেক ভালো না, ব্যাঙ্ক যখন ফেল পড়ে, ফটকাখেলার এক ধাক্কায় জানলা দিয়ে লাফিয়ে মরে মিলিয়নেয়ার? যখন এরোপ্লেনে আগুন লাগে, যুদ্ধে দেশ জ্ব'লে যায়, এক মিনিটে জ্যান্ত মানুষ পদার্থের পিণ্ড হ'য়ে প'ড়ে থাকে?···ভালো, এ-ই ভালো—আর লুকোচুরি না, এবার মুখোমুখি, খোলাখুলি।

আপিশের টেলিফোনটার কিছু বোধহয় বিগড়েছিলো, কথা বুঝতে কতক্ষণ লাগলো! চিনতেই পারেনি শ্রীপতিবাবুর গলা, নামটা বার-বার 'স্বপতি' শুনছিলো। চাপা আওয়াজ, আবছা কথা, মাঝে-মাঝেই মিলিয়ে যাচ্ছে। বেশ পরিশ্রম হ'লো টুকরোগুলি মিলিয়ে নিয়ে অর্থ করতে। উনি কাল ফিরেছেন টু্র থেকে···হ্যাঁ, সব ভালো আছে ওরা, মীরার খুব ভালো লাগছে জায়গাটা···তা আমরা ভেবেছিলুম তুমি উইক-এণ্ডে···আমি? আমার কিছু ঠিক নেই, পরশুও যেতে পারি আবার—তা তুমি বেশ ভালো আছো তো, একলা বাড়িতে কোনো···হ্যাঁ, শোনো, এইমাত্র বীরেশ এসেছিলো আমার কাছে—না, পরেশ না, বীরেশ, বী-, বী-, বীরেশ, পরেশের দাদা—এসেছিলো নিজেরই দরকারে—আবার কোথায় হাউস তুলছে, এয়ার-কণ্ডিশণ্ড করাবে এটা, তাই আমাদের ফার্মে···তা আমি তোমার ঐ ফিল্মের কথাটা···বীরেশ কিন্তু কিছুই জানে না, আর পরেশ—হ্যালো! হ্যাঁ, পরেশের কথা যা বললো

—হ্যালো, হ্যালো!—পরেশের নাকি মাথার দোষ হয়েছে—হ্যাঁ, মা-থার, মাথার দোষ—একটু কেমন ছিট ছিলো বরাবরই, কিন্তু এখন নাকি …যা বললো সে বিশ্রী কাণ্ড, বীরেশকে মারতে গিয়েছিলো একদিন, অথচ এই বীরেশই ওকে…এখন বাড়ি ছেড়ে…বম্বে গেছে? কে জানে বম্বে না বসিরহাট না কলকাতাতেই কোথাও…এই তোমাকে যেমন অনর্থক…তা ছ্যাখো কিছুই বলা যায় না, ভাইয়ে-ভাইয়ে ব্যাপার তো… বীরেশের সব কথাই যে··বলছিলাম যে ব্যাপার বোঝা শক্ত, বাট বেস্ট বি কশাস…কথাটা সত্যি হ'লে মোস্ট অনফরচুনেট…তা তুমি…সত্যি যদি ফিল্মের লাইনে…আমি না হয় বীরেশকে ব'লে·· হ্যালো? বীরেশের ঠিকানা? নিশ্চয়ই। তুমি দেখা করলে…তবে পাচশো-সাতশো দিতে চাইবে আরকি প্রথমে—তা আমি বলি মন্দ কী, মাস্ট বিগিন সামহোয়েয়ার …হ্যাঁ, ওর আপিশটা ধরমতলায়, ক্যালকাটা পিকচার্স, ক্যাল-কা-টা পিক-চার্স—বিকেলের দিকে থাকে বোধহয়—বেটার ড্রপ ইন সাম ডে, আজও যেতে পারো, আমি না-হয় টেলিফোনে…আমার কাছে একটু ওব্লিগেশনেও আছে এখন…আর হ্যাঁ, একবার বেড়িয়ে যেয়ো না ওখানে…ফাইন ক্লাইমেট, প্লেন্টি অব চিকেন্স…আ-চ্ছা, আ-চ্ছা।

এর পর? কী করেছিলো? কেমন ক'রে কেটেছিলো ঘণ্টাগুলি? মনে পড়ে না। এটুকু শুধু মনে পড়ে হালকা লেগেছিলো, আরামদায়ক হালকা, যেন শরীরে আর ওজন নেই, মনেও কোনো ভার নেই;— সব খোলা, চারদিকের দরজা খোলা, যেখানে খুশি যেতে পারে, যা খুশি তা-ই করতে পারে। আপিশের কাজ আজ যেন তাকে ছুঁলোই না, সব সহজ হ'য়ে গেছে, দায়িত্ব নেই—যদি ফেলে রাখে, যদি ভুল করে, তাতেই বা কী—গাঙ্গুলিকে আর পরোয়া কিসের, কেউ কোনো ক্ষতি

তার করতে পারে না।…ঠিক—এটাই তো ঠিক, না-হ'য়েই পারতো না, অন্য-কিছু হ'তেই পারতো না। হঠাৎ এক কথায় পাঁচ হাজার? বলামাত্রই রাজি? কে বিশ্বাস করবে, করতো, নির্বোধ সোমেন দত্ত ছাড়া, আর তারই স্ত্রী, গান্ধীগ্রামে বদ্ধপরিকর, ইচ্ছায় প্রবল, স্বামীর পরিচাবিকা, পবিচালিকা। 'মাথার, মাথার দোষ।' নয়তো কেউ রাজি হয় ও-রকম? অত বেশি কথা বলে? অত লম্বা কথা বলে? যখন টাকা নিয়ে আসবে ব'লেও এলো না, তখনও একবার ভাবলে না, সোমেন?…বম্বে? 'কে জানে বম্বে গেছে না বসিরহাট!'…আর তারই উপর নির্ভব ক'রে, যেন স্বয়ং ভগবান এসে ব'লে গেছেন… ফিরতে দেরি দেখেও বুঝলে না, সন্দেহ করলে না কিছু, তল্লাশ নিলে না একবার··তারই উপর নির্ভর ক'রে তুমি…থাক। আর ভেবো না, আর তো কিছু ভাবনার নেই, নিশ্চিন্ত হ'লে;—পরেশ লাহিড়ী যা-ই হোক না, বীরেশ যদি বাড়িয়েও ব'লে থাকে, তোমার আর ভাবনা নেই।…নিশ্চিন্ত হ'লে।

অভ্যাস তবু মরে না, চেষ্টার অভ্যাস, চেষ্টায় কিছু হ'তে পারে জীবের এই সংস্কার কী দুর্বার! যুদ্ধ থামে না, প্রতিরোধ ক্ষান্ত হয় না, খাঁচায় প'ড়েও ছটফট ছুটোছুটি করে ইঁদুর। তাই আপিশের পরে… নিজে যেন কিছুই করলো না, অন্য কেউ তাকে তুলে দিলো ধরমতলার ট্র্যামে, নামিয়ে দিলো আশ্চর্য নির্ভুল। ট্র্যামের ভিড়ে টিঁকতে না-পেরে, কিংবা ভিড়েরই ধাক্কায়, হঠাৎ যেখানে নেমে পড়লো, সামনেই ভাখে ক্যালকাটা পিকচার্স। খোদাই করা নেম-প্লেটটির দিকে তাকিয়ে থাকলো একটুক্ষণ—কেন আর? ফিরে যাই—কিন্তু তখনই দেখলো সিঁড়ি ভাঙছে…এই দোতলা…তে-তলা…ওঠো, আর-একটু, কয়েকটা মোটে…এ—ই চৌতলায় পৌঁছলাম।

স্লিপ পাঠাবার আধ ঘণ্টা পরে ডাক পড়লো।

—বসুন। শ্রীপতির কাছে শুনছিলাম। পরেশ কবে গিয়েছিলো আপনার কাছে? (ভাইয়ের সঙ্গে কিছু মেলে না: চাঁচাছোলা মুখ, চাপা ঠোঁট, অল্প কথা। ঠিক যেমন বিজনেসম্যানকে হ'লে মানায়।)

—এ-মাসের প্রথম দিকে গিয়েছিলেন।

—নবেম্বর মাসের? তার আগেই আমাদের কনসার্ন সে ছেড়ে গেছে।

—জানি। আমাকে বলেছেন সে-কথা।

—ও, বলেছে? আলাদা ব্যবসা শুরু করছে বলেনি?

—তাও বলেছেন।

—সকলকেই তা-ই বলছে শুনি। সত্যি করছে হয়তো। আমি তার কিছুই জানি না। তাই তার কোনো কমিটমেণ্টের দায়িত্ব—

—আমি সেজন্য আসিনি। পরেশবাবুর কোনো খবর যদি পান—

—নিশ্চয়ই! আপনিও কিছু শুনলে-টুনলে আমাদের জানাবেন। এখন ঠিক সুস্থ নেই সে—আমাদেরও ভাবনা হচ্ছে।···আচ্ছা··· তাহ'লে···

—আর-একটু কথা ছিলো আমার। আমি ফিল্মের একটা বই লিখেছিলাম—

—পরেশের জন্য?

—হ্যাঁ, ওঁর কথাতেই লিখেছিলাম। তা আপনি যদি সেটা—

—বেশ তো। ছ-মাস পরে একবার যদি নিয়ে আসেন।

—ছ-মাস পরে ?

—তার আগে তো হয় না। ছ খানা বই হাতে আছে এখন, সে-দুটো আগে নেমে যাওয়া চাই।

—নিয়ে রাখা যায় না কোনোরকমে !

—এখন ?···আচ্ছা আপনি একবার—ডিসেম্বরে আমি খুব ব্যস্ত থাকবো, আপনি জানুয়ারির প্রথম দিকে—

কোন সুদূর পরপারে জানুয়ারি। ·কিন্তু ভালো, এ-ই তো ভালো; আর-কিছু করবার নেই, ভাববার নেই—চেষ্টার শেষ, আশার অবসান, নিশ্চিন্ত।

—কিধার, সাব ?

কোথায় ? কোন রাস্তা ? কোথায় না যাচ্ছি ? হাঁ্যা, মালতী সেন।

রাসবিহারীর মোড় পেরিয়ে ট্যাক্সি চললো দক্ষিণে, একটু পরে কাঁকুলিয়ার গলির মধ্যে থামলো।

* * *

আবার যখন তেতলার সিঁড়ি ভেঙে নিজের ঘরে ঢুকলো, তখন, ততক্ষণে বুঝলো কত সে ক্লান্ত হয়েছে। পুঞ্জিত ক্লান্তি, সারা দিনের, অনেক দিনের, অনেক দিন-রাত্রির—গাঙ্গুলির ফরমাশ, লাহিড়ীর ফরমাশ, আর মীরার—মালতী সেনের—সেই ফাঁস-পরানো পাঁচশো টাকা—এই এক মাসের সমস্ত সংগৃহীত ক্লান্তি হঠাৎ তাকে দৈত্যের হাতে আঘাত করলো। টলে প'ড়ে গেলো বিছানায়: ঘুম, ঘুম, ঘুমুবে। ভুলে যাও, ভুলে থাকো, সব ভুলে যাও; শ্রীপতিবাবুর টেলিফোন, কাঁকুলিয়ার কুটচক্র, আর মালতী সেনের মায়াবী করুণ

ঠোঁটের রেখা, তাও, তাও ভোলো, সব ভোলো। বিমাতার মতো দিন, জেগে-জেগে খরচ হবার জীবন, তার মুঠি থেকে কত ভাগ্যে আমরা মায়ের কোলে খ'সে পড়ি;—আদিম মাতা, তমস্বিনী, প্রাণিণী, দৃষ্টিহীনা, তৃপ্তির চেতনাতীত আধার—ফিরে যাই নীল নির্জন মাতৃযোনিতে, উৎসে, সেই অনাক্রমণীয় অন্ধকারে, যেখানে আত্মা স্বয়ংপূর্ণ, সত্তার বুভুক্ষিত উৎপীড়ন যে-অন্ধকারে পথ খুঁজে পায় না।

—'বাবু!'

ঝাপসা দেখলো রতনকে; ঘরের দেয়াল, চেয়ার টেবিল, সব ঝাপসা দেখলো।

'খাবার দেবো?'

খিদের প্রচণ্ড দংশন হঠাৎ অনুভব করলো সোমেন, জঠরের অন্ত্র তন্ত্র কাৎরে উঠলো ব্যাকুল। ওদের থামাতে হয়, কিছু লকড়ি ঠেলতে হয় উনুনে। ওঠো, টেনে তোলো শরীরটাকে, আবার একটু বেঁচে ওঠো;—এখনো বেঁচে আছো তুমি, রক্তেমাংসে কযেদি, সেই পশুটার চাহিদা মেটাও।

খাওয়ামাত্রই বিছানা, শোওয়ামাত্রই ঘুম। ঘুমের বন্যা নেমে এলো, কালো, কালো, কী অপরিসীম কোমলতায় স্পর্শময়! কিন্তু ঠিক যে-মুহূর্তটিতে সে তলিয়ে যাচ্ছে, ডুবে গিয়েছে প্রায়, বলতে গেলে চেতনার সীমা ছাড়িয়েই গেছে, ঠিক তখনই, যেন জলে-ডোবা দেহের মতো, চেষ্টাহীন ভেসে উঠলো উপরে, ফেরৎ এলো, ফিরে এলো বিছানায়, ঘরে, বেঁচে থাকায়—যেন এখনো রাতই হয়নি, দিনটাই মুখোশ প'রে কালো হ'য়ে গেছে—এলো সেই দিনের জীবনে, নিত্য যাকে জাগিয়ে রাখে স্মৃতি, ঘুমোতে দেয় না, শান্তি দেয় না।

সব মনে পড়লো। সবচেয়ে স্পষ্ট হ'য়ে মনে পড়লো মালতী সেনের

আবছা-বলা কথা। কী লজ্জা, কী-দারুণ লজ্জা কাটিয়ে ও-সব কথা নিজের মুখে বলতে হ'লো!

—অনতিক্রম্য লোকচক্ষু! চোখের আড়াল, কৌতূহলের বাহিনী, সমাজবোধের অপরাজেয় আক্রমণ! কে আসে রোজ সন্ধেবেলা তার কাছে? কেমন আত্মীয়? ভোরে উঠে তানপুরো নিয়ে গান গায়, তবলাও আছে ঘরে! শুনি তো বিধবা, দুটো ছেলেও আছে, তবে কেন কুমারী সেজে রঙিন শাড়ি? অন্য কোনো বিচারও তো দেখি না—ছেলেদের সঙ্গে এক হাঁড়িতেই খাওয়া, যখন-তখন বাড়ি থেকে বেরোনো—এদিকে নাকি সিনেমার স্টুডিওতেও যাওয়া আসা! তাহ'লে সন্ধেবেলা যিনি আসেন, তিনি ··

অতএব সচ্চরিত্র কাঁকুলিয়ার মালতী সেনকে হজম হ'লো না, ঢেঁকুর তুলে উগরে দেবে এবার।

'আমার তেমন অমত ছিলো না বাছা,' বলেছেন হোমিওপ্যাথির বড়ি-পাঠানো হৃদয়বতী গিন্নি, 'তবে কত্তা ভারি কড়া মানুষ, আর পাড়ার লোকেরাও—আজকাল তো শুনি কত কিছুই হচ্ছে চারদিকে—আর কে বা কার খবর রাখে কলকাতায়—তবে আমরা বোঝো তো, সেকেলে মানুষ—আর এতকাল আছি পাড়ার মধ্যে—কোনোরকম গোলমাল কিছু হ'লে—আমাদেরও তো দুষবে সঙ্গে সঙ্গে, জেনে-শুনে আমরা কেন—আর তোমারও তা-ই ভালো বাছা—একটু চোখের আড়ালে—সুবিধেমতো দেখে-শুনে নাও কোথাও—কিছু মনে কোরো না, আমি হয়তো বুঝবো তোমার দোষ নেই, কিন্তু লোকে কেন মানবে বলো—আর সত্যি তো, ভালো তো দেখায় না!'

না, ভালো দেখায় না। সন্ধেবেলা যে আসে তাকে ভালো দেখায় না। শেষ পর্যন্ত আমি তার এই করলাম!

তাহ'লে—?

এর পরেও ডেকে পাঠিয়েছে আমাকে। এর পরেও? এই জন্যেই। কাকে আর ডাকবে, কাকে আর বলতে না-পেরেও বলবে? আর ডেকে না-পাঠালেও না-গিয়ে আমার উপায় আছে? তার কাছে বাধ্য আমি, দ্বিগুণ, বহুগুণ বাধ্য। সব খোশা ছাড়ানো হয়নি এখনো, এখনো ঠিক শূন্যে এসে ঠেকেনি—এখনো আমি তার বন্ধু, বিশ্বস্ত বন্ধু, একমাত্র সহায়, আশ্রয়স্থল। এই আমি!

এবার ধ্বংস হবো দু-জনেই। দেরি নেই—ঘন্টা বেজে গেছে।

আজ তার চোখে কিছু দেখলাম, স্বচ্ছ গভীর সুন্দর কোনো-কিছু, যেন এরই মধ্যে ইতিহাসে সমৃদ্ধ, অতীতের মেদুরতায় ঘনায়মান। ধীরে ফুটে উঠছে অতীত, কোনো-এক অভিজ্ঞানী অতীত, তাকে আর আমাকে জড়িয়ে, সম্মত চোখে ভেসে উঠছে, জন্ম নিচ্ছে—না, নিয়েছে, স্থাপিত হয়েছে এরই মধ্যে। একই ইতিহাসের অংশীদার আমরা, একই কর্মফলের অধিকারী। দু-জনেই ধ্বংস হবো এবার, তার চোখে এই আজ দেখলাম।

কী তৃষ্ণা নিয়েই তার দিকে আজ তাকিয়েছি! আমার চোখ বারে-বারেই থমকে দাঁড়িয়েছে, তার গায়ের জীর্ণ লাল শালটিতে, ছায়া-ক'রে-আসা কপালে, বলতে-গিয়ে-বেধে-যাওয়া কথায় মাঝে-মাঝে স্পন্দিত কণ্ঠটিতে—আর চোখে, তার চোখে, তার চোখে! তাকে ছেড়ে আসার অনিচ্ছা কখনো এত প্রবল আমার হয়নি;—যখন রাত হ'লো, অংশু ঘুমে ঢুলছে, যখন আর না-উঠলেই নয়, তখনও উঠেই মনে হ'লো আবার ব'সে পড়ি, ব'সে পড়ি মেঝেতেই তার পায়ের কাছে, বলি আমার কথা শোনো, কথা শুনে ঠেলে দিয়ো না, তোমার হাত থেকে ফেলে দিয়ো না আমাকে—উদ্ধার করো। না, পারি না বলতে,

মিথ্যা ছাড়া কিছুই এখন পারি না। আজও বলতে হ'লো ভাবনা কী, বলতে হ'লো কাল-পরশুই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা দেবে—ঠিক পৌঁছে যাবে বোনের বিয়ের আগে, বলতে হ'লো অন্য বাড়ি জুটবেই;— আর সে যখন দ্বিতীয় বার জিগেস করলো অসুখ করেনি তো, কেমন দেখছি আজ আপনাকে, তখন ঈষৎ হাসি টেনে বলতে হ'লো কিছু না।

কিন্তু কী ভাবছি? ঘুমোইনি কেন? তাই তো! জেগে আছি! ঘুম, ঘুম, ঘুমুবো।

…না, পারে না, কিছুই পারে না। এই দু-দিন, তিন দিনের মধ্যে মালতী সেনের পাঁচশো টাকা ফিরিয়ে দেবে? উদ্ধার করবে বন্ধক-রাখা কালো বাক্সটা? খুঁজে দেবে অন্য বাড়ি এখনকার এই কলকাতায়? বাড়িওলার বিবেকপীড়া রৌপ্য রসে গলিয়ে দেবে? হয়তো চল্লিশের বদলে পঞ্চাশ দিলেই—হয়তো কেউ দিতে চাচ্ছে— কিংবা কিছু মোটা হাতে সেলামি—কিংবা যদি মিনতি ক'রে বলে… সে বলবে? সে? না, না, কোনোটাই পারে না। কিছুই সে পারে না আর। এখন আর অন্য কিছু নেই, মালতী সেন, সব দেয়াল দরজা হ'য়ে খুলে গেছে।

—শ্রীপতিবাবুর কাছে? তাই তো, শ্রীপতিবাবু তো আছেন! কিন্তু কী বলবে গিয়ে? সব কথা উজাড় ক'রে পায়ে পড়বে? শ্রী-প-তি-বা-বুর? না পারবে না-া-া পারবে না এর উপর কথা নেই।

তাহ'লে—?

মীরার গয়না!—তড়াক ক'রে উঠে বসলো বিছানায়—ঠিক! কত ভাগ্যে মীরা এখন বাড়ি নেই! কিন্তু··গয়নার বাক্স বৌদির

সিন্দুকে রেখে যাবে বলেছিলো না? 'সারাদিন ফাঁকা থাকবে বাড়ি—রতন অবশ্য পুরোনো লোক, তবু—' ঠিক বুঝেছে মীরা, বিশ্বাস নেই, পুরোনো চাকর পুরোনো স্বামী কাউকেই বিশ্বাস নেই।

যাবার তাড়ায় ভুলে যায়নি তো? যদি বাড়িতেই থাকে—আলমারিতে?

আস্তে বিছানা ছেড়ে নামলো, আলো জ্বেলে মনে পড়লো চাবি? একগোছা ডুপ্লিকেট না কোথায়—ঠিক!—ড্রেসিং টেবিলের দেরাজে। টানতে গিয়ে শব্দ হ'লো···শুনলো কেউ? কে আবার শুনবে, আর শুনলেই বা কী! আমি আমার নিজের বাড়িতে যা খুশি তা-ই করতে পারি না হোক না কেন যতটাই রাত্তির?

মরচে-পড়া চাবির গোছা হাতে তুললো সোমেন, বিশ্রী আওয়াজ হ'লো শিকলের মতো। চাবি নিয়ে ওঠার সময় চকিতে নিজের ছায়া দেখলো আয়নায়। লাল চোখ মাতালের মতো, শুকনো ঠোঁট শাদা—ঘুম, ঘুম চাই, এইবার আরাম ক'রে ঘুমুবো।

কোন চাবি? এটা?···এটা?···বাঃ, এই তো খুলে গেলো! ছাখো কাণ্ড পাশের বাড়িতে, রান্নাঘরে আলো জ্বেলে রেখেই চাকররা কেউ···না কি কাজ এখনো ফুরোয়নি···না কি খামকাই দাঁড়িয়ে আছে হাঁ ক'রে, তাকিয়ে আছে এইদিকেই? কী দেখছো হে? আমি ভদ্রলোক, আমার স্ত্রীর আলমারি খুলছি বিশেষ দরকারে···ভারি বেয়াদব তো! অন্য বাড়িতে তাকিয়ে থাকতে হয় না জানো না?··· আচ্ছা, তাকাও যত খুশি, জানলা বন্ধ ক'রে দিলাম।

এখন সাবধান, একটুও না অগোছালো হয়। মীরা এসে বুঝবেই না আলমারি কেউ খুলেছিলো।···কোথায়? এখানেই থাকে না বরাবর? নেই। ওদিকে?···নেই। নিচের তাকে? দেরাজে?

হাত যেখানে সহজে পৌঁছয় না এমন কোথাও?···নেই, নে-ই! থাকতেই হবে, পেতেই হবে, চাই, ওটা চা-ই আমার! সব নামাও, তন্নতন্ন খোঁজো—যেখানে থাক বের করো খুঁজে!

কোথাও পাওয়া গেলো না। ভুল করেনি মীরা, বৌদির সিন্দুকেই রেখে গেছে।

আবার একে-একে সব তুললো। শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ, চাদর, ওয়াড়, বুলবুলের ফ্রক, বাপ্টির হাফ-প্যান্ট শার্ট—কত!—আর একেই মীরা বলে কিছু নেই! তুলতে গিয়ে ভাঁজ ভাঙলো, কুঁচকে গেলো সিল্কের ব্লাউজ, এক গোছা গরম জামা ঝুপ ক'রে প'ড়ে গেলো একবার।··· থাক, আর পারে না। তবু তুলতে হ'লো, কিন্তু গোছাবার চেষ্টাও আর করলো না, যেমন-তেমন তালগোল ক'রে পাকিয়ে যেখানে হয় সেঁধিয়ে দিলো। মীরা এসে···মীরা এসে?···মী-রা··? কী ভাবছিলো ভুলে গেলো; মীরা কোথায়, মীরা কে, সব যেন ঝাপসা হ'লো হঠাৎ। আ-:, ঘুম!

কাঁপছি কেন শুয়ে-শুয়ে—শীত? লেপ টেনে দিলো নাকের উপর, তখনই আবার ঠেলে দিলো। কিচ্ছু না, এখন আর কিচ্ছু না, ঘুম, ঘু-ম, ঘুমুবো। ঘুমুতেই হবে। ঘুম, নিদ্রা, ধাত্রী, দাত্রী—শুধু তারই কিছু দেবার আছে মানুষকে, অন্য সবাই হরণ করে, লোকশানের লাল কালিতে চিহ্ন আঁকে জলজ্বলে। লোকশান, লোকশান। কথাটা ঘুরতে লাগলো মগজের মধ্যে, পোকার মতো, বোকার মতো, বেরোয় না, থামে না কিছুতেই। জীবনটাই লোকশান। জীবনে পাওয়া ব'লে কিছু নেই, পাওয়া মানেই খোওয়ানো। পেয়েছিলে যৌবন, বোঝোনি সেটা জরার মুখবন্ধ। পেয়েছিলে স্ত্রী, তার কারণে সন্তান, আবার সন্তানের কারণেই তোমার জীবন থেকে স্ত্রী স'রে গেলো। ভালোবেসে-বেসেই

ক্ষয় ক'রে দিলে ভালোবাসা, বেঁচে-বেঁচেই খরচ ক'রে ফেলে জীবন। বোঝো না, তাই চেষ্টা ক'রে টাকা বাঁচাও সাবান বাঁচাও শাড়ি বাঁচাও— কিন্তু জীবন? জীবনটাকে বাঁচাতে পারো কি? নিশ্বাস নেয়া থামাতে পারো?

সোমেন অনুভব করলো নিজের নিশ্বাস, এই, এই, উঠছে, পড়ছে, প্রতি মুহূর্তে খরচ হ'য়ে যাচ্ছি। প্রতি মুহূর্তে নিশ্বাস, নিতেই হবে, না-নিয়েই পারবা না কখনো। এ-কথা ভাবতে-ভাবতে মনে হ'লো নিশ্বাস আর নিতে পারে না, বুক ফেটে গেলো দম আটকে—উ—:! ঘুম, ঘুম, ঘুমোতে কি পারবোই না আজ রাত্রে?

চুপ! চুপ করো! বেরোও! বেরিয়ে যাও মাথার ভিতর থেকে আমার, নয়তো ঠুকে দেবো দেয়ালে, ফাটিয়ে দেবো যা-কিছু ওর মধ্যে আছে। আমি ঘুমবো, আমি পণ করেছি ঘুমবো, এ—ই, এই ছাখো ঘুমিয়ে পড়ছি··ঘুমিয়ে পড়লাম। কয়েক ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা, কিছুক্ষণ— কিছুক্ষণ আমি খরচ হবো না, আস্ত থাকবো, বৃদ্ধি পাবো। কিন্তু তারপর? উঠবে তো সকালে? যে-মুহূর্তে জাগলে, হ'লে, আবার জন্মালে, সে-মুহূর্তেই ঘুরতে লাগলো খরচ হবার চাকার পর চাকা।

শুধু কি তোমার? এই তো বিশ্ববাঁধন, বিশ্ববিধান। তাকিয়ে ছাখো পৃথিবীর দিকে, সূর্যের এক ফোঁটা উপচে-পড়া আগুন, কেমন ক'রে ধীরে-ধীরে তাপ জুড়োলো, জল থেকে মাটি জাগলো, মাটিতে গাছ, ফুল থেকে ফল, অসংখ্য প্রাণী, অফুরন্ত বৈচিত্র্য—কত সুন্দর সাজলেন সেই প্রলয়পয়োধির মেদিনী। কিন্তু ওখানেই কি থামলো? আরো কমছে তাপ, নিরন্তর কমছে, কমতে-কমতে চাঁদের মতোই ফতুর হবে একদিন, ঠাণ্ডা হবে সব, লুপ্ত হবে তুষারের আচ্ছাদনে, কিছুই থাকবে না।

লোকশান, অপরিমাণ লোকশান। কেন তবে হওয়া, কিছুই যদি কোনো-একদিন না থাকে? তিমিরে তবে প্রথম কেন আলো ফুটেছিলো, সব আলো একদিন যদি নিবে যায়? বিশ্বের বিরাট কারবারে আর-কিছু কি লক্ষ্য নেই- লাল বাতি জ্বালবে ব'লেই মহোল্লাসে নেচে-নেচে ঘুরছে?

সোমেনের যেন চোখের সামনে লাফিয়ে উঠলো সূর্য, লাল, বিশ্বের হৃৎপিণ্ড, প্রাণভাণ্ডার, লাল শিখা লাফিয়ে উঠলো অন্ধকারে, আকাশ ভ'রে দিলো···আরো সূর্য, হাজার, লক্ষকোটি আলো-বছর দূরে-দূরে, অযুত গ্রহ, উপগ্রহ, লক্ষ্যহারা প্যারাবোলায় অসীমযাত্রী ধূমকেতু, যুগলগ্রহ, প্রণয়ীর মতো পরস্পরকেই ঘিরে-ঘিরে ঘুরছে,—আর এই বিনর্তিত আলোকিত রঙ্গমঞ্চের প্রান্তে, এখনো অস্পষ্ট-থাকা ছায়াপথের নেপথ্যে, আরো কত অর্বুদ জায়মান জগৎ, ভ্রূণকম্পন, প্রস্তুতি, বিশাল আণবিক চঞ্চলতা! চঞ্চলতা কিসের? ফতুর হবার, ফুরিয়ে যাবার, না-হবার। তাই তো সব খরচ হবে, হচ্ছে, সব, পাগলের মতো খরচ হ'য়ে যাচ্ছে, চলেছে উন্মাদ বেগে—কোথায়? আর-কোথাও না, মৃত্যুর দিকে—মুক্তির দিকে। মৃত্যু থেকে মুক্তি আছে আর কোথায়, শুধু মৃত্যুতে ছাড়া? তাই কেউ কিছু ভাবছে না, হাতে কিছুই রাখছে না, সঞ্চয়ের কোনো কথাই নেই সেখানে, নেই যুদ্ধ, জীবনসংগ্রাম;—আছে শুধু দেউলে হবার দৌড়, কে কার আগে ফুরোতে পারে তারই তীব্র প্রতিযোগিতা।

না, সৃষ্টির মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়নি, কৃপণ নয় সে, প্রলয়বিলাসী, তার খাতার শেষ পাতায় শূন্যফলই অবধারিত। কে আনলো জীবনযুদ্ধ এই মাটিতে, শুধু পৃথিবীর মাটিতে, প্রাণীর অস্তিত্বে—নোংরা, নিষ্ঠুর, অত্যাবশ্যক;—টিকটিকির মুখব্যাদন, ময়ালের জড়িয়ে-ওঠা আলিঙ্গন, রূপবান প্রজাপতির

আত্মরক্ষী দুর্গন্ধ ;—আর সমুদ্রে দলে-দলে শ্বাপদ, শব্দহীন, করাত ছোরা তলোয়ার নিয়ে তৈরি, কারো ধড় নেই, শুধু দম্ভিল মুণ্ডময়, কারো এত খিদে যে টুকরো ক'রে কাটলেও কপ ক'রে নিজেরই অঙ্গ গিলে খায় ;—আর এদেরই মধ্যে, এদেরই সঙ্গে, কোন বিস্মৃত জন্মান্তরে এদের পিছনে ফেলে-আসা মানুষ, আশ্চর্য মানুষ, শ্রেষ্ঠ জীব, সৃষ্টির মুকুটমণি—তার যুদ্ধ কোথায় না আজ ছড়িয়েছে। যুদ্ধ ঘরে-ঘরে, ফুটপাতে, ধানখেতে, জাহাজঘাটে শেয়ারবাজারে বস্তিপাড়ায় ; দেশে-দেশে, পৃথিবী ভ'রে ;—চলছে অবিরাম ; আজ যারা ধুলোয় প'ড়ে মার খাচ্ছে কাল তারাই চাবুক পেয়ে তেমনি চালায়, আবার তলে-তলে তেমনি ছুরি শানায় উদ্ধারকারী পরোপকারীর দল ;···যেখানে যাও, যেদিকে তাকাও, ইতিহাসের কোন প্রথম ভোর থেকে এ-ই শুধু চলছে, শুধু যুদ্ধ, যুদ্ধের চাকার পর চাকার বিরতিহীন ঘূর্ণন।

কিন্তু কেন? বাঁচার জন্য?···কাকে বলে বাঁচা? বাঁচছো এই কথাটাই ভুল, প্রতি মুহূর্তে মরছো জানো না, জানো না সেই তিলে-তিলে ম'রে যাওয়ার সমাপ্তিরই নাম দিয়েছো মৃত্যু? জন্মের মুহূর্ত থেকেই মৃত্যু ব'সে আছে তোমার মধ্যে, দিনে-দিনে বাড়ছে, ফুটে উঠছে—স্ফীত-হওয়া ধমনীতে, শ্লথ-হওয়া হৃৎপিণ্ডে—ফলিয়ে তুলছে পরিপক্ক ফল ;—তাকে এড়াও, ঠকাও, যত দিন পারো ঠেকিয়ে রাখো—জানো না এই চতুর খেলারই নাম দিয়েছো বাঁচা, বেঁচে থাকা, জীবন? কিন্তু সত্যি যদি ঠেকাতে চাও তবে তো তোমায় ডাকতে হয় তাকেই, বেড়িয়ে প'ড়ে খুঁজতে হয় তাকে, ছুটতে হয় তোমাকেই তার পিছনে ;—যদি কোনোরকমে তাকে ধ'রে ফেলতে পারো, তবে তো তখনই তার কাজ থামলো, আর তো ম'রে যাওয়া নেই, নেই তিলে-তিলে হারিয়ে ফেলা,

ফুরিয়ে যাওয়া ;—আর তুমি খরচ হবে না, শুধু মৃত্যুতেই আর তোমাকে খরচ হ'তে হবে না।

…সোমেনের চোখ অন্ধকারে খুলে গেলো। ঘুম? স্বপ্ন? আমি কোথায়? শব্দ নেই, অন্ধকার। আমি কোথায়? কেউ একটু আলো জ্বেলে দাও, কেউ কোনো শব্দ করো একবার—আমি জেগে আছি! আমি জেগে আছি, আমি ফুরিয়ে যাচ্ছি, আমি খরচ হ'য়ে গেলাম! না, না, আর পারি না, আর আমি খরচ হ'তে পারি না, কিছু আর নেই আমার, সব বেরিয়ে গেছে—সব তুই খেয়েছিস, রাক্ষস!—রাক্ষস, রাক্ষসী রাত্রি, ভগবান, আর কি কখনোই আমি ঘুমোতে পারবো না?

১৬

এলো আবার রবিবার। সারা দুপুর ঘুমিয়ে উঠলো সোমেন। বাইরে বিকেল, কিন্তু ঘরের মধ্যে এখনই কালো, এখনই ওৎ পেতে ব'সে আছে রাত্রি, রোমশ গায়ে গুড়িগুড়ি এগোচ্ছে। ঘর থেকে বারান্দায় এলো, হলদে আলো ঝিলিক দিচ্ছে হাওয়ায়। কিন্তু বিকেলটাকে এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে শীতের সন্ধ্যা ঝুপ ক'রে নামলো।

চা? নিশ্চয়ই। আজ শীত বেশি? দিনে ঘুমোলে শীত বাড়ে, জিভের উপর চায়ের তাপ নামুক। ধোঁয়া-ওঠা চা, একটু বিস্কুট, সিগারেট। সবই ভালো, অন্য যে-কোনো দিনের মতোই, যেন কিছুই হয়নি, এমনি চলবে সকাল দুপুর বিকেল রাত্রি, যেন থামতে হবে না, যেন কোনোখানে কেউ ধ'রে ফেলেনি আসল কথাটা— যে এত কিছু ভালোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ঘুম।

ঘুম, নিদ্রা, সুষুপ্তি। সেই এক রাত্রির অনিদ্রার পর সোমেন চিনতে পেরেছে তাকে, খুঁজে পেয়েছে, আবিষ্কার করেছে। ডাক্তাররা উপকারী বইকি। এখন আর ঘুমের কোনো অকুলোন নেই তার, তার ঘরে ঘুমের এখন ছড়াছড়ি। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে তেষ্টা আর মেটে না।

খুঁজে-খুঁজে টাকা সিকে আধুলি দুয়ানি যা-কিছু পেলো সঙ্গে নিলো সোমেন। পথে বেরোলো।

মোড়েই ডাক্তারখানা। চেনা ডাক্তার হেসে বললেন, 'বসুন। তারপর, ঘুম-টুম হচ্ছে?'

'ওঃ, খুব। কিন্তু ওষুধটা আরো চাই।'

'হিপ্নল? আর কেন?'

'নিয়ে রাখি। যদি রাত্রে আবার—'

'কিন্তু রোজ খাওয়া তো ভালো না। কড়া ওষুধ, ডিপ্রেসিং ফর দি হার্ট। আপনার চেহারাও খুব খারাপ দেখছি।' ডাক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হলেন।

'ঘুমোতে পারলেই ঠিক হবে। ওটা দিন।'

'আচ্ছা, নিয়ে যান দুটো। কিন্তু একটার বেশি খাবেন না। অর্ধেক হ'লেই ভালো।'

'হ্যাঁ, অর্ধেকেই কাজ হয়। চমৎকার ওষুধটা, ডাক্তারবাবু!' সোমেন হঠাৎ একটু হাসলো।

'আপনি যে-রকম বললেন যে ব্রোমাইডেও ধরে না—নয়তো খুব সীরিয়স কেস ছাড়া এ-সব দিই না আমরা। আর দু-একদিন খেতে পারেন—তারপর কিন্তু আর না। একটু গরম জলে স্নান ক'রে নেবেন শোবার আগে, মাথায় ঠাণ্ডা জল দেবেন—তাহ'লেই ঘুম হবে।'

'আচ্ছা, থ্যাঙ্কিউ।' ওষুধ নিয়ে সোমেন উঠলো।

কয়েক পা গিয়েই আর-একটা ডাক্তারখানা। এটাও চেনাশোনার মধ্যে।

'হিপ্নল আছে?'

'হিপ্নল? ওটা তো নেই, স্যর।'

'আছে বোধহয়,' হিশেবের খাতা থেকে ডাক্তার চোখ তুললেন। 'চার নম্বর আলমারিটা ছাখো তো।' তারপর সোমেনের দিকে তাকিয়ে: 'কী হ'লো? বাড়িতে অসুখ?'

'আমারই অসুখ। ইনস্‌ম্নিয়ায় ভুগছি। আছে নাকি?'

'পেয়েছি, স্যর। ক-টা দেবো?'

'একটা দাও,' জবাব দিলেন ডাক্তার।

'বরং দুটো দিন।'

'দুটোয় কী হবে। ওয়ান ইজ এনাফ।'

'দুটো হ'লে দু-দিন চ'লে যাবে।'

'কী, একদম ঘুম হয় না? ভালো না এ-রকম, আর এমনিও আপনাকে রান-ডাউন দেখছি।···আচ্ছা, দুটোই নিন, কিন্তু নেহাৎ দরকার না-হ'লে—'

'দরকার না-হ'লে আর ভাবনা কী।'

'এর আবার হাঙ্গামা আছে তো—' ডাক্তার কাগজ টেনে নিচু হলেন—'প্রেস্কৃপশন লিখতে হয়। আসুন—আট আনা।'

'থ্যাঙ্কিউ, ডক্টর।'

রাসবিহারী এভিনিউ ধ'রে সোজা হাঁটলো সোমেন, পশ্চিম থেকে পুবে। কত ওষুধের দোকান--অবাক লাগলো তার—গুনলে বোধহয় সবচেয়ে বেশি। না কি খাবারের দোকান আরো বেশি, মিষ্টির, রেস্টোর‍্যাণ্ট নানান রকম। ছাখো তাকিয়ে বিজ্ঞাপন, প্রকাণ্ড দুই তথ্যের পাশাপাশি প্রতিযোগী বিজ্ঞাপন: খিদে আর ব্যাধি, সৃষ্টি আর ক্ষয়, হওয়া আর ফুরিয়ে যাওয়া। মনে হচ্ছে ডাক্তারখানাই বেশি;—এত রোগ আছে সংসারে, ধ'রে ফেলার এত কৌশল, এত দীর্ঘ, অসহ্য ঘটায় ক্রমশ-ঘন-হওয়া পূর্বস্বাদ! তবু পালানো চাই, ব্যর্থ জেনেও চালানো চাই খেলা?

সব স্পষ্ট হ'য়ে গেছে, সব সহজ। এখন এক পা শুধু এগোনো বাকি।

রাস্তার যেদিকে হাঁটছিলো, সে-ফুটপাতে একটা দোকানও বাদ

দিলো না। কোনোটায় নেই, কেউ বা প্রেস্ক্রিপশন চাইলো। কিন্তু জুটেও গেলো মন্দ না; যতক্ষণে তিনকোণো পার্ক ছাড়ালো, ততক্ষণে আটটি জমেছে পকেটে। এতে হবে? আচ্ছা, গড়েহাটের মোড় অবধি যাওয়া যাক; ফিরবে না-হয় উল্টো ফুটপাত ধ'রে, ও-দিকেও ডাক্তারখানা অনেক। বেশি হ'লে দোষ নেই, কিন্তু কম চাই না—কম কিছুতেই না হয়।

ঘুম, ঘুম, ঘুমের গন্ধমাদন নিয়ে যাবে আজ।

গড়েহাটের মোড়ে এসে নিশ্চিন্ত হ'লো। নতুন দোকান, লোকটাও আনাড়ি নিশ্চয়ই—একেবারে আস্ত শিশি বেচে দিলো। একটুখানি শিশিতে কত ঘুম ধ'রে গেছে, ছোট্ট লাল কুড়িটি বড়িতে কত ঘুমের দেশ, মহাদেশ, রাজত্ব, সাম্রাজ্য! বিশ্বস্ত ওরা, ঠকাবে না, অন্তত ওরা কথা রাখবে।

কিন্তু একটু দেরি আছে এখনো। কেন জানে না, সত্যি কোনো কারণ নেই, কিন্তু মনে হচ্ছে আরো কিছু সময় তাকে কাটাতে হবে, বইতে হবে আরো কিছু ঘণ্টার ভার। গন্তব্য তার স্থির, কোনো বাধা আর নেই, কিন্তু বাধ্যতাও নেই, কাঁটায়-কাঁটায় পৌঁছবার কোনো বাধ্যতা নেই। স্বাধীন সে, স্বেচ্ছায় চলেছে; এই একবার—অন্তত এই একবারের মতো—সম্পূর্ণ সে নিজেই নিজের কর্তা।

বাস্ ধ'রে পাঁচ মিনিটে লেকে পৌঁছলো। শীত, ভিড় কম, বেঞ্চি ফাঁকা-ফাঁকা। ব'সে পড়লো যে কোনোটায়। পাশের বেঞ্চিতে আর-একজন, কান-মাথা মুড়ি দিয়ে নিস্পন্দ, ছায়ার মধ্যে ছায়ার মতো মেশা, হঠাৎ চোখে পড়ে না। বোধহয় বুড়োমানুষ—কেন ব'সে আছে, কী ভাবছে? কী ভাবে তারা, যারা এমনি সন্ধ্যায়, কিংবা হয়তো দুপুর কিংবা দশটা বেলায়, লেকের ধারে বেঞ্চিতে এসে বসে, জলের

দিকে তাকিয়ে থাকে চুপ ক'রে, কিংবা তাও তাকায় না, হয়তো বা চুপ ক'রেও থাকে না, আপন মনে বিড়বিড় করে মাঝে-মাঝে—কী ভাবে সেই প্রান্তবাসী পরিত্যক্তের দল? সময়—নিষ্ঠুর সময়—কাটাতেই হবে; একটু থামে না সে, একটু নামে না, সিন্দবাদের মতো চেপে আছে ঘাড়ের উপর—যতক্ষণ একটু ক্ষীণ হালকা সুতোয় ঝুলে আছো, সকাল-সন্ধ্যার প্রকাণ্ড ভার থেকে নিস্তার নেই তোমার।

অথচ ঐ সুতোটুকু ছিঁড়ে ফেলতে কতক্ষণ! ওটো বেঞ্চি ছেড়ে, একটু এগিয়ে যাও, একটুখানি পা বাড়াও। কিন্তু জল ঠাণ্ডা, ছটফটানি অনেকক্ষণ, পরে আবার ফুলে উঠবে, বিশ্রী হবে দেখবে, মাছেরা ঠুকরে নেবে নাক-চোখ। কিন্তু আজ এই শীতের রাত্রে লেকের জলের চেহারা ঠিক মানিয়েছে। চেহারাই নেই; কুয়াশার পরদা পড়েছে ঘন, অন্ধকার বলীয়ান হ'য়ে দূর থেকে পাড়ের দিকে ছড়ালো; বোঝাই যায় না জল ব'লে, মাটিও হ'তে পারে, কিংবা হয়তো জল-মাটির মাঝামাঝি অন্য-কিছু, হয়তো তোমার সব ইচ্ছার নতুন কোনো কল্পনাতীত মিলনস্থল।

ইচ্ছা? ঐ কথাটাতেই শত্রুপক্ষের জিৎ। এখনো মনে পড়ছে কত কিছুই বাকি থাকলো। পুরোনো বালিগঞ্জে সেই-যে একদিন দেখেছিলো—গাছের ছায়া-ফেলা গলি, একটু বেঁকে গেছে, পিয়ানো বাজছিলো টুংটাং চৈত্রমাসের দুপুরবেলায়; ভেবেছিলো আর-একদিন আসবে, ঐ পথটুকুতে হাঁটবে একবার;—হ'লো না। দশ বছর ধ'রে ভেবেছে মার্সেল প্রুস্ত প'ড়ে উঠবে কোনো-একদিন; ছ-মাস ধ'রে ভেবেছে হাওড়ায় তার বিনুমাসিকে দেখে আসবে এক ফাঁকে। কোনোটাই হ'লো না। এমনি কত অসংখ্য সূক্ষ্ম ইচ্ছার জালেই তো মাছির মতো, পোকার মতো আটকে থাকি আমরা;—যতক্ষণ-না

সেই ধ্বংসহীন জালে মুহূর্তের কাঁপন তুলে পিছন থেকে লাফিয়ে পড়ে কারো উপর। কিন্তু অপেক্ষায় থেকো না; নিজেই ছিঁড়ে বেরোও, দাঁড়াও মুখোমুখি। হাঁ খোলা আছে বিরাট, তোমার মতো অনেককে ধ'রে যাবে সেখানে, ঠেলে-ঠুলে জায়গা ক'রে নিতে হবে না, প'ড়ে থাকার ভয় নেই।

ঢুকে পড়ো।

···যাকে কারণ ব'লে মনে হয় আসলে সব ছুতো। ঘুমভাঙা, পরেশবাবু, মালতী সেন, সব যেন পর-পর জুটে গেলো, পরস্পর মিলে গেলো ঠিক যেন সাজানো গল্প; আস্তে, বেশি তাড়াহুড়ো না-ক'রে, কিন্তু অদম্য বেগে, ঠেলে তাকে এগিয়ে দিলো এই দিকে, এনে দিলো এই চরম প্রান্তে।···এরা? না, এরা সব ছুতো, উপলক্ষ্য, কোনোটারই নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। ও-সব না-ঘটলে অন্য কিছু ঘটতো, ঘটনা ছাড়া জীবন হয় না। তুচ্ছ, মূঢ়, প্রগল্‌ভ ঘটনা—উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী—তারই বিধানহীন বাঁধনে আমরা বন্দী। আসল কথা অন্য রকম: ঘটনার চাকর খাটতে আর সে পারে না; আসল কথা ক্লান্ত হয়েছে, বড়ো ক্লান্ত; এখন ঘুম, ঘুম চাই, ঘুম। মীরার চিঠি কালও আবার পেলো। থাকবে কিছু দিন, মাস পড়লেই টাকা পাঠাতে লিখেছে—'আর তুমি অবশ্য এসো একবার—না-হয় ব'লে-ক'য়ে অ্যানুয়েল লীভটা এখনই নিয়ে নাও। এখানে চমৎকার, এলে তোমার শরীর সারবে।' টাকা; কাল মাসপয়লা, মাইনের তারিখ, ঘটনা সব সেজেই আছে। এ-মাসে দু-শো টাকা কম পাবে মীরা; একটু অবাক হবে। আর মালতী, মালতী সেন, তুমি কি ভাববে ভাবতে পরি না; অপরাধী আমি তোমার কাছে; ক্ষমা কোরো।

এ-ক'দিনে ফন্তু এলো কতবার, দু-বার, তার মা-র লেখা চিঠি নিয়ে।

'ভালো আছেন তো? আপনি না-এলে বড়ো ভাবনা হয়।' 'কালও এলেন না! কেন আসেন না? আমি বড়ো অস্থির আছি।' বোনের বিয়ে এসে পড়লো, এখনো কি ভাবছে টাকা পাঠাতে পারবে? এখনো কি ভাবছে কাঁকুলিয়ার বিরুদ্ধে, কুটিল কলকাতা এবং কুটিলতর জীবনের বিরুদ্ধে, আমি ছাড়া অন্য তার বন্ধু নেই? আর এখনো কি—অসহ্য চিন্তা! এখনো কি চোখে তার এক ফোঁটা আলো কাঁপছে সন্ধেবেলা, কোনো একজন আসবে ব'লে—কিছু আনবে ব'লে নয়, শুধু আসবে ব'লেই।···কেন, কেন, কেন তার দেখা হ'লো আমার সঙ্গে, কেন আমি কখনো তার চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম, কেন আমি চীৎকার ক'রে কাঁদতে পারি না?

উঠে দাঁড়ালো সোমেন; যেন হঠাৎ জরুরি কিছু মনে পড়েছে, এমনি দ্রুত হাঁটতে লাগলো। যেন ঝাপসা চোখের মরীয়া মানুষ অচেনা পথে হাঁটছে, কোথায় আছে কোথায় যাচ্ছে জানা নেই। কিন্তু কোনো-এক রাস্তায় এসেই চলা তার শিথিল হ'লো, দোতলা বাড়িটির সামনে এসে পা যেন আর ওঠে না। পাশের গলি দিয়ে চোরের মতো টিপে-টিপে ঢুকলো, একটু এগিয়েই দেয়াল ঘেঁষে থামলো, দাঁড়ালো নিঃসাড়। দরজা বন্ধ, যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে জানলা দিয়েও কিছু চোখে পড়ে না, শুধু আলো জ্বলছে বোঝা যায়, শুধু দেখা যায় পাঁচটি দেয়ালের কোনো-একটিতে তানপুরোর লম্বা ছায়া পড়ছে। সেই ছায়াটির দিকেই তাকিয়ে থাকলো সোমেন, আর হঠাৎ এক অসম্ভব ইচ্ছায় কাৎরে উঠলো তার শরীর—এগিয়ে যেতে, দরজার কাছে দাঁড়াতে, দরজা ঠেলে ভিতরে যেতে—তাকে দেখতে, একবার শুধু চোখে দেখতে। ইচ্ছা ঠেকাবার চেষ্টায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁপলো একটুক্ষণ, হাতের মুঠি শক্ত ক'রে চোখ বুজলো একবার; তারপর পা

ফেরালো, ছুটলো রাস্তার দিকে, আবার ঘুরলো এলোমেলো আবোল-তাবোল কিছু না-দেখে না-বুঝে চিনতে না-পেরে।

হঠাৎ বড়ো রাস্তা; ট্রাম, ভিড়, ঠেলাঠেলি। কী করছে সবাই? ফুটপাতে চাটাই বিছিয়ে ব'সে গেছে সারি-সারি, কেরোসিনের ডিবে জেলে, কেউ-বা মোমবাতি, সামনে আলু পেঁয়াজ কমলালেবু পাটালিগুড়। কাছে-কাছে মাছির মতো মানুষ ঘুরছে: গালভাঙা বুড়ো, দাড়ি-ওঠা কেরানি, কর্কশ মুখের আধ-বয়সী মেয়ে, চ্যাপ্টাবুকের বিশ্রী ঢ্যাঙা কুমারী; থলে হাতে, নিচু হ'য়ে, তীক্ষ্ণ চোখে; ঘাঁটছে, খুঁটছে, বাছাই করছে, খুঁজছে ফুটপাতে অলিতে-গলিতে নিচু হ'য়ে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে—খাদ্য, শুধু খাদ্য! সোমেন তাড়াতাড়ি পার হ'তে লাগলো, কিন্তু আলু-পেঁয়াজের স্তূপ যেন ফুরোয় না, যেন মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠছে আরো, আর-কিছু টিঁকতে দেবে না এখানে—না ঘাস, না ফুল, না একটু নিষ্কলুষ মাটি—শুধু কঠোর ফুটপাত, আর ফুটপাতে ক্ষুধার বিজ্ঞাপন, জীবিকার, জীবনসংগ্রামের নোংরা ইতর উলঙ্গ প্রতিযোগিতা!

একটু পরে ফুটপাত পরিষ্কার, আলো কম, চুপচাপ। একটা বড়ো বাড়ির দেয়াল পড়েছে, দোকান বসতে পারেনি, ভিড় নেই। সেখানে, সেই গোপনীয় আধো-ছায়ার হৃদয় থেকে, অন্য এক আওয়াজ উঠছে, মানুষের আওয়াজ ঠিক নয়, আহত কোনো দুর্বল পশুর গোঙানির মতো, একটানা শব্দ, অবিরাম, এক সুরে অবিরাম উঠছে, যেন কোনো রহস্যময় মন্ত্রের অফুরন্ত আর্ত উচ্চারণ। সোমেন চলতে-চলতে শুনলো কয়েকবার, হঠাৎ একটু থামলো। এই শব্দের উৎসটিকে দেখতে পেলো সামনে; দেয়াল ঘেঁষে প'ড়ে আছে আধো-আলোর আরামদায়ক গোপনীয়তায়, কিছু-একটায় সম্পূর্ণ ঢাকা কিছু-একটা পদার্থ, অবয়ব চেনা যায় না, পরিচয়ের চিহ্ন কিছু নেই। জাতি, গোত্র, বংশ ইত্যাদির

শ্রেণীবিভাগের বাইরে ;—আর-কিছুই লুকোনো নেই আচ্ছাদনের তলায়, শুধু একটা প্রাণী, জীবিত কোনো পদার্থ, কোনো অস্তিত্ব, যে-অস্তিত্বের একমাত্র প্রকাশ ঐ একটিমাত্র শব্দের ক্লান্তিহীন, ক্লান্তিকর পুনরুচ্চারণে।

আওয়াজটা কী? কোনো ভাষা আছে ওতে? মানুষের স্বাক্ষর আছে কিছু? সোমেন মন দিয়ে শুনলো, হঠাৎ স্পষ্ট শুনলো—'ভগবা-ন! ভগবা-ন!' ধুলো থেকে উঠছে এই শব্দ; যেখানে সবাই মাড়িয়ে যায় সেখান থেকে; যেখানে কেউ তাকায় না, শিশুরা ভয় পায়, দূর থেকে পয়সা ছুঁড়ে দেয় দয়ালুরা—উঠছে সেখান থেকে কোনো-একটা ভাষাকে আশ্রয় ক'রে নিরুত্তর ব্রহ্মাণ্ডের দিকে। 'ভগবা-ন! ভগবা-ন!'···এ কি আশ্চর্য নয় যে তবু ঐ শব্দটা এখনো আছে! যখন আর সমস্তই ঝ'রে যায়, দোকান মানুষ সকাল বিকেল কিছুরই কোনো অর্থ আর থাকে না, শুধু গলা দিয়ে কোনোরকমে একটু আওয়াজ বেরোয়—তখনো ঐ কথাটা হারায় না, তখনো ঐ শব্দটা তবু থাকে!

আছে?···আনন্দ, অমৃত, কল্যাণ, এক কণা অদৃশ্য কস্তুরী আমার—সে-ও কি আছে কোথাও? আছে—থাকতেই হবে—তৃষ্ণায় আমি ম'রে গেলাম তার জন্য, যদি সে না থাকবে তবে এই তৃষ্ণার কেন অন্ত নেই? জানিনি তখন, বুঝিনি ভালো ক'রে, কিন্তু তাকেই তো আমি চেয়েছি সারা জীবন, খুঁজেছি সবখানে, শান্তিহীন লিপ্সায়, তৃপ্তিহীন কামুকতায়। তাকেই তো ধরতে চেয়েছি বার-বার কথার ফাঁদ পেতে, বার-বার অবাধ্য কবিতায়।···কথা, কবিতা, আমার প্রেম, আমার স্বাস্থ্য, আমার শুদ্ধতা, তুমি তো এখনো আমাকে ছেড়ে যাওনি, কিন্তু আমি কি আর কোনোদিন তোমাকে ঘরে আনতে পারবো?

সেই আধো-ছায়ার ফুটপাতে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে থাকলো সোমেন; একটানা তার কানে এলো অস্পষ্ট বিকৃত প্রার্থনা, সেই অর্থহীন বুদ্ধিহীন উচ্চারণ। কেন ডাকছে? কী চায়? বাঁচতে চায়? ঐ মনুষ্যাকৃতি পদার্থটার উপর হঠাৎ কেমন ঘৃণা হ'লো সোমেনের—ভীরু, পঙ্গু, অক্ষমের দল, দিনের পর দিন দয়ার উপর জুলুম ক'রে-ক'রে সবলকে দুর্বল ক'রে দেবে, নোংরা ক'রে দেবে জীবিতের দিনের আলো—তবু বেরিয়ে পড়ার দরজা খুলে কিছুতেই পা বাড়াবে না? সোমেন পকেটে হাত দিয়ে সেই লাল বড়ির ছোট্ট শিশিটা অনুভব করলো একবার, হঠাৎ অদ্ভুত আওয়াজে হেসে উঠলো একটু। চলো, বাড়ি ফেরো, সময় হ'লো।

• • •

দরজা-বন্ধ ঘরে চেয়ারে ব'সে আছে খাড়া পিঠে। সামনের টেবিলে কাচের গেলাশ গলা অবধি ভরতি। ঘন রঙের জল, লাল, মদিরার মতো, রক্তের মতো লাল। সেই মোহন রঙের জলটাকে চামচে দিয়ে নাড়ছে, ছোটো ছোটো বুদ্বুদ উঠছে তলা থেকে, একটু ফেনা ভাসছে উপরে। মনেও ঢেউ উঠছে দু-একটা। বাপ্টি, বুলবুল—সকাল-বেলার বিছানায় গায়ের উপর বাপ্টির সেই হাতটা। যা-কিছুর প্রতিনিধি মীরা, সেই সব। যৌবনের দিন, ছেলেবেলা, কোনো-এক দুপুর রাতে ঘুম ভেঙে বৃষ্টি শোনার সুখ। যদি মীরাকে টেলিগ্রাম ক'রে দেয়, আজই, এখনই—কালই ওরা চ'লে আসে তাহ'লে। যদি কোনো আশ্চর্য উপায়ে এখনই ফিরে আসে মীরা, এখনই, এই মুহূর্তে, যদি পায়ের শব্দ এক্ষুনি শোনে সিঁড়িতে, একটু পরেই কচি গলার ডাক—'বাবা!'

কেউ ডাকলো?···কী-সব ভাবছে।

উঠে দাঁড়ালো, গেলাশ তুললো ঠোঁটের কাছে। একটু কাঁপলো হাত, নামিয়ে রাখলো। এক হাতে টেবিলটাকে চেপে ধ'রে অন্য হাতে আবার তুললো, চুমুক দিলো লাল রঙের জলে। মিষ্টি—তেতো—বিশ্রী—কিন্তু ঠোঁট থেকে নামালো না, আর-একটু···একটু···শেষ। গ্লাশ নামিয়ে বিছানায় শুতে গেলো, কিন্তু দুরন্ত হাওয়া উঠলো হঠাৎ, পৃথিবীর সব হাওয়া একসঙ্গে, শোঁ-ও, শোঁ-ও-ও ব'য়ে গেলো কানের মধ্যে, ঝড়, তুফান, ঢেউ—সমুদ্রের ঢেউ, সমুদ্র, পৃথিবীর সব সমুদ্র আর সমস্ত হাওয়া একসঙ্গে উদ্দাম ঝাঁপিয়ে পড়লো, নিয়ে চললো প্রচণ্ড বেগে তাকে ভাসিয়ে। সোমেন বিছানায় পৌঁছতে পারলো না, তার আগেই মেঝের উপর প'ড়ে গেলো।

১৭

সোমেনের ছোট্ট বসবার ঘরটিতে বেলা দশটা নাগাদ এক ফালি রোদ আসে শীতকালে। ঐ রোদটুকুতে পিঠ দিয়ে চুপ ক'রে বসে আছে মীরা। স্নান ক'রে এসেছে এইমাত্র, পিঠে চুল খোলা, মুগা রঙের কটকি শাড়ি পরনে। কোলে তার গল্পের বই, কিন্তু বই খোলা হয়নি। কাছেই মেঝেতে ব'সে বাপ্টি বুলবুল লুডো খেলছে, তাদের দিকেও মন নেই তার। শুধু ব'সে আছে, কিছুই করছে না, কিছু ভাবছে বোধহয়।

একটু পরে ঘরে এলেন পরেশনাথ লাহিড়ী।

'সব ঠিক হ'য়ে গেলো, মা-না,' বসামাত্রই তিনি কথা আরম্ভ করলেন, 'এই ডিসেম্বরেই শুটিং আরম্ভ হবে। ডিরেক্টর ঠিক করলাম অর্জুন বটব্যালকে···নতুন, কিন্তু কাজ করে ভালো, ছাখোনি "কূলভাঙা নদী"তে? আর হীরো হ'লো রঞ্জনকুমার—একটু মোটা হ'য়ে যাচ্ছে আজকাল, কিন্তু মুখটি এখনো খাশা, বক্স-অফিসে নামের খুব জেল্লা এখনো। সবাই বলছে বই খুব ভালো হয়েছে, খুব জমবে ফিল্মে।'

মীরা চুপ ক'রে শুনলো, কথা বললো না।

'সবই ভালো হ'লো, শুধু হিরোয়িন নিয়েই ভাবনা হচ্ছে। নামজাদারা সবাই তো প্রায় বম্বেতে, আর নতুনদের মধ্যে—আচ্ছা, চন্দ্রিমাকে কেমন লাগে তোমার? দেখেছো কোনো ফিল্মে?'

'দেখেছি। মন্দ কী।'

'তাকেই ঠিক ক'রে ফেলা বটব্যালের ইচ্ছে। কিন্তু আমি—আমার

ঠিক মন উঠছে না। নাক-চোখ চন্দ্রিমার তো ভালোই, কিন্তু মগজ ব'লে পদার্থ নেই—একদম তোতাপাখি পড়াতে হয়। ও-রকম শক্ত পার্ট পারবে কি ?···আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলাম।'

মীরা একবার তাকালো পরেশনাথের দিকে।

একটু দেরি করে পরেশনাথ বললেন, 'অত খোঁজাখুঁজির দরকার কী। মায়ার পার্ট তুমি করো না !'

'আ-মি !' আস্তে বেরোলো মীরার কথাটা।

'খুব ভালো হয়, ময়না, সবচেয়ে ভালো হয় তাহ'লে।'

'কী যে বলেন !'

পরেশনাথের চোখের পাতা পড়লো একবার। বম্বে থেকে ফিরে অবধি দেখছেন ময়না তাকে 'আপনি' ছাড়া বলছে না। কিন্তু এ-বিষয়ে কিছু বলতে পারেননি এখনো—যা গেলো ওর উপর দিয়ে, আস্তে-আস্তে মনটা একটু ভালো হোক।

গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'নানা দিক থেকেই কথাটা আমি ভাবছি। এই তো মন-খারাপ ক'রে ঘরে ব'সে থাকো, একটা কাজ হ'লে সময়টা তবু কেটে যায়। আর ও-বইয়ের মর্ম তুমি যত ভালো বুঝবে, তেমন কি আর অন্য কেউ !'

'ভালো বুঝলেই বুঝি পার্ট করা যায় ?'

'অন্যান্য যা দরকার তাও তো তোমার আছে।' পরেশনাথ এক পলক তাকালেন মীরার মুখে, চোখ সরাতে দেরি হ'লো একটু। 'আর অন্য দিকটাও ভেবে ছাখো। সোমেন দত্তর বই, অভিনয় করছে তার স্ত্রী—এতে পাব্লিকের মনে—'

'বাপ্টি বুলবুল স্নান করতে যাও এবার,' মীরা বাধা দিলো পরেশনাথের কথায়।

'আজ বড্ডো শীত, মা!'

'স্নান করলেই শীত চ'লে যাবে। মঙ্গলা!'

মঙ্গলা এসে দাঁড়ালো দরজার ধারে।

'বাচ্চিকে তেল মাখিয়ে দাও ভালো ক'রে—আর রতনকে বোলো ওদের স্নান হ'লে ভাত দিয়ে দিতে। একটু ঘি দিতে বোলো ভাতের সঙ্গে।'

লুডো তুলে রেখে ভাই-বোন অনিচ্ছায় চ'লে গেলো। মীরা চোখ ফেরালো পরেশনাথের দিকে।

'এক-এক সময় আমার সন্দেহ হয়, জজদা, যে গুজবটা নেহাৎ মিথ্যে নয়; সত্যি আপনার মাথার একটু দোষ হয়েছে।'

নিচু গলায় লম্বা ক'রে হাসলেন পরেশনাথ।—'তোমার পার্ট করার কথা বললাম ব'লে? কিন্তু এতই কি অসম্ভব কথাটা? কত ভালো-ভালো ঘরের মেয়েরা আজকাল···আর তাছাড়া···পরেশনাথ থামলেন একটু, যেন একটু আলগা ক'রে বললেন, 'যা দিনকাল পড়লো, এর মধ্যে ছেলেপুলে নিয়ে···ঐ থেকে চালাতে হ'লে এ-টাকায় তোমার ক-দিন আর।'

মীরা কথা বললো না, ছোট্ট নিশ্বাস পড়লো তার।

পরেশনাথের মুখেও একটু ছায়া পড়লো। খুব মিহি ক'রে বললেন, 'সত্যি।···বম্বে থেকে ফিরেই যখন শুনলাম···কিন্তু কেন? হয়েছিলো কী?'

'ঠিক বোঝা গেলো না কিছুই।'

'কিছু লিখে যায়নি?'

'পুলিশের হাঙ্গামা বাঁচাতে যেটুকু দরকার।'

'আর-কিছু?'

মীরা জবাব দিলো না। জিগেস করলো, 'আপনি অত দেরি করলেন কেন বম্বেতে?'

'তোমাদের এই ফিল্মেরই কাজে আটকে ছিলুম, ময়না। হিন্দিও হবে তো—তার জন্য আর্টিস্ট ঠিক করা—হাউস বুক ক'রে রাখা—সময় লাগে এ-সবে। আর ইতিমধ্যে আমার দাদাটি দিব্যি ব'লে বেড়িয়েছেন আমি পাগল হ'য়ে গিয়েছি! বাঃ!'

'আমি একটু অবাক হয়েছিলাম দাদার কাছে সব শুনে।'

'অবাক হবার কিছু নেই, তাতে বীরেশ লাহিড়ীর ভারি সুবিধে কিনা। বাণীরূপার ব্যবসাটি তাহ'লে মৌরশিপাট্টা হ'তে পারে ওঁর। কিন্তু পরেশ লাহিড়ী কেন পাগল তাও উনি বুঝবেন যখন হাইকোর্টের শমন পাবেন! আমার অংশ ছাড়বো নাকি আমি, ঠুকে দশ লাখ টাকা আদায় করবো না! তখন দেখবে এই আলফা ফিল্মস-এর কাছে কোথায় প'ড়ে থাকে বাণীরূপা!

মীরা কিছু বললো না; একটু চুপচাপ কাটলো।

পরেশবাবু বসার ভঙ্গি বদল করলেন। 'আচ্ছা, উঠি এবার। এখন যেতে হবে স্টুডিও ভাড়ার আগাম টাকা দিতে।' চেয়ারে সোজা হলেন তিনি, কিন্তু তখনই উঠলেন না, একটু পরে জিগেস করলেন, 'ইনশিওরেন্স কোম্পানির চিঠি কিছু পেলে?'

'পেয়েছি। ও-সব ঠিক আছে।'

'ইনশিওরেন্সও যদি কিছু বেশি ক'রে···তা বইগুলি আছে তোমার, তাও তো ফেলে দেবার নয়। এই তো আজ একটা বই থেকেই পাঁচ হাজার পেয়ে গেলে। কিন্তু এ-রকম আর ক-বার হবে! আমার কথাটা ভেবে দেখলে পারো। এই তো দেখে এলাম বম্বেতে—সমুদ্রের

খারে কী-বাড়ি হাঁকড়েছে মিলি বর্ধন! আর এই সেদিন কলকাতায় ওকে···হ্যাঁ, তোমার গান্ধীগ্রামের খবর কী?'

মীরার গালের ছোট্ট পেশী কেঁপে উঠলো হঠাৎ, লম্বা পলক চোখের কোলে নেমে এলো। একটি হাত, চেয়ারের হাতলে নিঃসাড় প'ড়ে-থাকা, আস্তে একটু উঠেই স্তব্ধ হ'লো আবার।

জবাব দিলো, 'দাদা দেখছেন ও-সব।'

'তা ওখানেও কিছু তুলতে-টুলতে হবে তো। যা শুনলাম মন্দ হবে না কলোনিটা—আর এই ভাড়াটে ফ্ল্যাটেই বা কতকাল—একটু ভেবে-চিন্তেও চলতে হবে এখন। কথাটা উড়িয়ে দিয়ো না ফশ ক'রে, একটু ভেবে দেখো। বই তোমার স্বামীর, তুমি অভিনয় করলে যদি ভালো হয়, আমি তো বুঝি সেটা তোমার কর্তব্যই।'

ঈষৎ ভঙ্গি হ'লো মীরার কাঁধে। কোলের বইটা খুলে একবার তাকালো।

'চলি এখন,' পরেশনাথ মস্ত শরীরে উঠলেন। 'কাল আবার আসবো—আর এখন তো আসতেই হবে মাঝে-মাঝে, এ-রকম একটা যোগাযোগ যখন হ'লো। আমি কিন্তু চন্দ্রিমাকে ঝুলিয়ে রাখবো আপাতত—দেখো, যদি তোমার মত বদলায়।'

'ভেবে দেখবো।' একটু হেসে, একটু মাথা হেলিয়ে অতিথিকে বিদায় জানালো মীরা।

পরেশনাথ চ'লে গেলেন। মীরা ব'সেই থাকলো। রোদ স'রে গেলো তার পিঠ থেকে, চেয়ারটি ঘুরিয়ে নিলো একটু, চোখে পড়লো জানলা দিয়ে চিলতে আকাশ। কোলের উপর খোলা বই প'ড়ে থাকলো।

টুক-টুক আওয়াজ হ'লো দরজায়। মীরা শুনেও শুনলো না।

আবার খুব মৃদু তিনটি টোকা পড়লো। উঠতে হ'লো মীরাকে।
গিয়ে একটুক্ষণ কথা বললো না, শুধু তাকিয়ে থাকলো।

'আমি—আমি একটু এসেছিলাম আপনার কাছে।'

'আসুন।'

'আসবো ?'

'আসুন।'

ঘরে এলো মালতী সেন। আলগা হ'য়ে বসলো, পিঠ সোজা, যেন একটু পরেই উঠবে। মীরা বসলো আগের চেয়ারটিতে, ঠিক আগের ভঙ্গিতে, চঞ্চল রোদটুকুর দিকে পিঠ হেলিয়ে।

একটুক্ষণ চুপচাপ।

প্রথম কথা বললো মালতী সেন : 'আমি আর-একদিন এসেছিলাম।'

'ও।'

'সেদিন দেখা হয়নি আপনার সঙ্গে। আমি—' মালতী হঠাৎ থেমে গেলো। মনে পড়লো সেই বিকেলবেলাটা, বাসি-হওয়া খবর-কাগজে হঠাৎ কয়েকটা লাইন—কেমন ক'রে ছুটে এসেছিলো তখনই, কিন্তু তেতলায় উঠে আর সাহস পেলো না, বাইরে একটু দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেলো দরজা থেকেই। দরজা হাঁ করা ছিলো, কিন্তু কান পেতেও শব্দ পেলো না ভিতরে, সব স্তব্ধ ;—আর তারপর রাস্তায় বেরিয়েও অনেকক্ষণ কোনো শব্দ শুনতে পায়নি।

'কী বলছিলেন ?' মীরা চোখ তুললো মালতীর দিকে, স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলো। এই সেই মুখ, শুধু সেই মুখের দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারতো—সে। ছাখো সেই মুখ তোমার সামনে, মন দিয়ে ছাখো, আবিষ্কার করো কী আছে ওখানে, কোন

সুখ, শান্তি, কোন আশ্চর্য আশ্রয়। কিন্তু তাকাতে গিয়ে কিছুই যেন দেখতে পেলো না, হঠাৎ চোখ ঝাপসা হ'লো।

সেই দৃষ্টি সইতে পারলো না মালতী, চোখ নামিয়ে নিলো। অস্ফুটে বললো, 'আমার কোনো কথা নেই। এমনি এসেছিলাম।'

'এসে ভালো করলেন। আমার একটু কথা আছে আপনার সঙ্গে। একটু বসুন।'

মীরা উঠলো; ভিতর থেকে নিয়ে এলো কালো রঙের বাক্স আর কালো চামড়ায় বাঁধানো খাতা। দুটোই মালতীর সামনে টেবিলের উপর রাখলো।

'এই বাক্সটা বোধহয় আপনার?'

মালতী কথা বললো না, মুখ তুললো না।

'আপনার বাক্সটি উদ্ধার করতে পেরেছি, এটুকুই তবু ভালো। আর এই খাতাটাও পাওয়া গেছে। আপনি দেখতে পারেন।'

মালতী হাত বাড়িয়ে খাতাটি তুললো। খুলে পাতা ওল্টালো, চোখ থমকালো নিজের নাম দেখে, কিন্তু একটু পরেই আর পড়া হ'লো না। অপরাধের প্রকাণ্ড ভারে আনত হ'লো সে।

মীরা বললো, 'খাতাটা আপনি নিতে পারেন ইচ্ছে করলে। সব কথাই আছে ওখানে।'

মালতী নড়লো না, শুধু তার কণ্ঠটি একবার স্পন্দিত হ'লো।

'আপনার চিঠি ক-টাও ওর মধ্যে আছে,' আবার কথা বললো মীরা।

স্তব্ধতা নামলো ঘরে, যেন স্তব্ধতার ভার, যেন মালতীর পিঠের উপর ক্রমশ জড়ো হচ্ছে, পিসে দিচ্ছে তাকে নিচের দিকে, মাথা তুলতে দিচ্ছে না। যেমন হয় বোবায় ধরা ঘুম থেকে জাগার সময়,

তেমনি হঠাৎ সারা শরীরে কেঁপে উঠলো সে, এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো তারপর।

'আমি যাই।'

'বাক্সটা নিয়ে যান।'

'এখন থাক।'

'থাক কেন? আপনি নিয়ে গেলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।'

'আর ক-টা দিন রাখতে হ'লে খুব কি অসুবিধে হবে আপনার?'

'আচ্ছা, পাঠিয়ে দেবো। কাঁকুলিয়ায় কত না আপনার নম্বর?'

'আমি এখন কাঁকুলিয়ায় নেই।'

'বাড়ি বদলেছেন?'

'বদলেছি মানে···আপাতত আছি একটা জায়গায়, কিন্তু শিগগিরই চ'লে যাবো।'

'কলকাতা ছেড়ে চ'লে যাবেন?'

'তা-ই যেতে হবে।'

'কোথায় যাবেন?'

'এখনো ঠিক জানি না। তবে যেতে হবে।'

মীরা কথা না বলে তাকিয়ে থাকলো মালতীর মুখে। এ-ই মালতী সেন, যার কাছে একটুখানি শান্তি পেয়েছিলো—সে। ভালোবেসেছিলো। তাকে ভালোবেসেছিলো মালতী? কিন্তু কেমন, এ কেমন তোমাদের ভালোবাসা—তাও তো বাঁচাতে পারলো না, তুমিও তাকে বাঁচাতে পারলে না, মালতী সেন!

'আমি যাই এখন,' ছোট্ট আওয়াজ শুনলো মালতীর।

হঠাৎ মীরা বললো, 'না, যাবেন না। এমন ক'রে বললো যে অমান্য করতে পারলো না মালতী, ধীরে আবার ব'সে পড়লো।

অনেকক্ষণ ব'সে থাকলো দু-জনে, দু-জন মেয়ে, চুপ ক'রে অনেকক্ষণ। মীরার চোখ বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জল নামলো নিঃশব্দে, দুই চোখ জলে ভ'রে গেলো মালতীর। কান্না থামলো, কিন্তু কেউ উঠলো না। বেলা বাড়লো রোদ স'রে গেলো, কিন্তু কেউ উঠলো না। কোন কথাও বললো না, কেউ তাকালো না কারো দিকে, শুধু নিঃশব্দে ব'সে থাকলো দু-জনে, যেন একজনের অন্য জন ছাড়া এখন আর কেউ নেই।

বুদ্ধদেব বসু

প্রণীত

অন্যান্য কয়েকটি বই

উপন্যাস ও গল্প

সাড়া
এরা আর ওরা
যেদিন ফুটলো কমল
ধূসর গোধূলি
অসূর্যম্পশ্যা
বাসর ঘর
পারিবারিক
পরিক্রমা
কালো হাওয়া
গল্পসংকলন
বিশাখা
ভিখিডোর

প্রবন্ধ ও ভ্রমণ

হঠাৎ-আলোর ঝলকানি
আমি চঞ্চল হে
সমুদ্রতীর
উত্তরতিরিশ
সব-পেয়েছির দেশে
কালের পুতুল

কবিতা

বন্দীর বন্দনা
কঙ্কাবতী
নতুন পাতা
দময়ন্তী
দ্রৌপদীর শাড়ি